সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

জুলাই ২০১৪

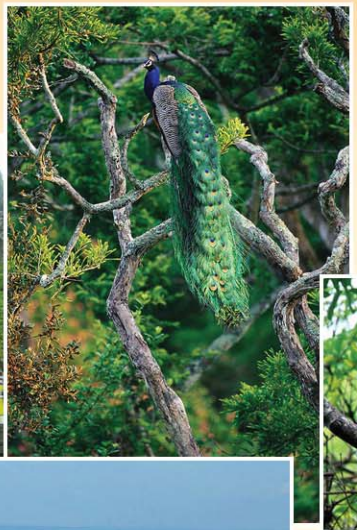

অতুলনীয় ভ!রত

৪ জুন ২০১৪ নৌপরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান এমপির সঙ্গে ভোমরা স্থলবন্দর পরিদর্শনে ঢাকাস্থ ভারতের হাই কমিশনার শ্রী পঙ্কজ সরন ও ডেপুটি হাই কমিশনার শ্রী সন্দীপ চক্রবর্তী ও অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তা

৯ জুলাই ২০১৪ ভারত প্রত্যাগত সার্ক কালচারাল ফোরামের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে চট্টগ্রামে নিযুক্ত ভারতের সহকারী হাই কমিশনার শ্রী সোমনাথ হালদারের সৌজন্য সাক্ষাৎ

২৩ জুন ২০১৪ আলাস্কার ডেনালি পর্বতে বাংলাদেশের পর্বতারোহী মুসা ইব্রাহিম

২৩ জুন ২০১৪ আলাস্কার ডেনালি পর্বতে বাংলাদেশের পর্বতারোহী মুসা ইব্রাহিমের হাতে বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্বের পতাকা

২৩ জুন ২০১৪ আলাস্কার ডেনালি পর্বতে বাংলাদেশের পর্বতারোহী মুসা ইব্রাহিমের হাতে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকার লোগো

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ বিয়ালিশ | সংখ্যা ০৭ | আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২১ | জুলাই ২০১৪

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা ওয়েবসাইট: www.hcidhaka.gov.in; লাইক ও ভিজিট করুন আমাদের page: High Commission of India, Dhaka

লাইক ও ভিজিট করুন ভারত বিচিত্রা page: Bharat Bichitra; ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের একাউন্ট: Iccr Dhaka

রাজস্থানের আঁকিবুঁকি

সিকিম ভ্রমণ

বিশেষ ভ্রমণ সংখ্যা

সূচিপত্র

রাজস্থানের আঁকিবুঁকি ০৪
তুঙ্গনাথে দ্বিপ্রহর ০৯
সিকিম ভ্রমণ ১১
নীরমহল ১৬
প্রাণের টানে ত্রিপুরায় ১৯
পশ্চিমঘাট ॥ বন্য ও বিস্ময়কর ২২
কবিতা ২৪
কাজিরাঙ্গা ॥ কল অফ দ্য ওয়াইল্ড ২৬
ধারাবাহিক: নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময় ৩৩
কেরালা ॥ এক মোহবিস্তারী সৈকতভূমি ৩৯
প্রবন্ধ: কাজী নজরুল ইসলামের গজল ৪২

অতুলনীয় ভারত

পায়ের তলায় সর্ষে বলে একটা কথা প্রচলিত আছে যার অর্থ হচ্ছে বেড়িয়ে বেড়ানো, সংস্কৃতে একেই বলা হয়েছে চরৈবেতি। ভারত বিচিত্রার এই সংখ্যাটি আপনার ভ্রমণপিপাসু মনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এতে আমরা ভারতের অগণিত দর্শনীয় স্থানের মধ্য থেকে কয়েকটিমাত্র আপনার সামনে উপস্থাপন করেছি, যাতে এই গরমে হিমালয়ের শৈলশহরে কিংবা কেরালার মোহবিস্তারী সমুদ্রসৈকতে আপনি তাপিত প্রাণ জুড়াতে পারেন। ভারত নামধারী প্রাচীন সভ্যতার লীলাক্ষেত্র এই মহাভারত বনজঙ্গল, পাহাড়পর্বত, মরুভূমিহিমবাহ অনুপম জীববৈচিত্র্য নিয়ে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। সুতরাং দেরি না করে বেরিয়ে পড়ুন আর আবিষ্কার করুন এক অতুলনীয় ভারতবর্ষের।

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স নূরন নাহার

মুদ্রণ গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি.
৫৫/১ পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০ ফোন ৯৫৫৪৮০৪

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩-৭, ৯৮৮৮৭৮৯-৯১ এক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৯৮৮২৫৫৫,

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান-১ ঢাকা-১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

ঢাকায় ভারতের বিদেশমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজের ব্যস্ত সফর

● আলোকচিত্র পিআইডি, তপন দে ও জীবন আমিরের সৌজন্যে প্রাপ্ত

সম্পাদকীয়

*ভারত বিচিত্রা*র প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে। সম্প্রতি প্রকাশিত *হিস্ট্রি অফ দ্য প্রেস ইন বাংলাদেশ* শীর্ষক তথ্যকোষ থেকে *ভারত বিচিত্রা*র জন্মলগ্নের বিশ্বাসযোগ্য তথ্যটি জানা গেল। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী পত্রিকাটির প্রকাশকাল এপ্রিল ১৯৭৪ বলে আমাদের প্রতীতি জন্মেছিল। যাহোক, নতুন তথ্যনির্দেশ অনুযায়ী *ভারত বিচিত্রা*র বয়স আরও একবছর বেড়ে দাঁড়াল বিয়ালিশ। অবস্থাদৃষ্টে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, *ভারত বিচিত্রা* এ মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো সাময়িকপত্র। পত্রিকাটির নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশনার জন্যে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন যেমন আত্মশ্লাঘা অনুভব করতে পারে তেমনি এদেশের বৃহৎ পাঠকসমাজ এমন একটি তথ্যবহুল সাহিত্যনির্ভর সাময়িকীর জন্যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাতে পারেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অনুসন্ধান। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতবর্ষের চিরকালীন ঐশ্বর্য। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধনের চেষ্টা ভারতের সর্বক্ষেত্রে চোখে পড়ে। বৈচিত্র্যের মধ্যে এই ঐক্যের অনুসন্ধান ভারতের রাজনীতি থেকে অর্থনীতি, সমাজনীতি থেকে কূটনীতি সর্বক্ষেত্রে। আপনি যদি ভারত ভ্রমণের জন্যে দ্রুত ধাবমান অজগরসদৃশ্য বৈদ্যুতিক রেলশকটে চেপে বসেন, উত্তরদ ক্ষিণ, পূর্বপ শ্চিম, ঈশান-নৈর্ঋত, অগ্নিবায়ু আটদি কের যে দিকেই যান না কেন, কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে আপনি নিজেই এই বৈচিত্র্যের প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে যাবেন। দেখবেন ক্রমে রং বদলাচ্ছে পরিপার্শ্বের– প্রকৃতি, মানুষজন, মানুষের পরিধেয়, আচারআচরণ, এমনকি ক ণ্ঠস্বর পর্যন্ত বদলে যাচ্ছে। দেখবেন, কিছুক্ষণ আগে যে ফেরিওয়ালা বা ভিখিরি দরদাম হাঁকছিল কিংবা গান গেয়ে ভিক্ষা করছিল, তার হাঁকডাকের ভাষা অন্যরকম হয়ে গেছে। আপনি বুঝতে পারবেন, আপনি নতুন এক সংস্কৃতির মধ্যে, নতুন পরিবেশে, নতুন এক দেশে এসে পড়েছেন। আপনার মনে তখন গুনগুনিয়ে উঠবে রবীন্দ্রনাথের সেই গান 'এলেম নতুন দেশে'। ভারতবর্ষের এই অতুলনীয়, অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্য আপনার অনুসন্ধিৎসু মনে নিশ্চয়ই দাগ কাটবে।

পায়ের তলায় সর্ষে বলে একটা কথা প্রচলিত আছে যার অর্থ হচ্ছে বেড়িয়ে বেড়ানো, সংস্কৃতে একেই বলা হয়েছে চরৈবেতি। ভারত বিচিত্রার এই সংখ্যাটি আপনার ভ্রমণপিপাসু মনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এতে আমরা ভারতের অগণিত দর্শনীয় স্থানের মধ্য থেকে কয়েকটিমাত্র আপনার সামনে উপস্থাপন করেছি, যাতে এই গরমে হিমালয়ের শৈলশহরে কিংবা কেরালার মোহবিস্তারী সমুদ্রসৈকতে আপনি তাপিত প্রাণ জুড়াতে পারেন। ভারত নামধারী প্রাচীন সভ্যতার লীলাক্ষেত্র এই মহাভারত বনজ ঙ্গল, পাহাড়পর্ব ত, মরম্নভূমিহিমবাহ অনুপম জীব বৈচিত্র্য নিয়ে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। সুতরাং দেরি না করে বেরিয়ে পড়ুন আর আবিষ্কার করম্নন এক অতুলনীয় ভারতবর্ষের।

ভ্রমণ

রাজস্থানের আঁকিবুঁকি

শ্রুতি নাহা সেন

জুনের শেষ সপ্তাহ অর্থাৎ ২২ জুন খুব ভোরে আমরা দিল্লি থেকে সাদা রঙের একটা ইনোভা গাড়িতে চড়ে বসলাম। গন্তব্য রাজস্থান। আমাদের এই দলে আছেন আমার দিদি সৌমী নাহা নাগ, দামণি দেবাশিস নাগ, আমার স্বামী সুতনু সেন, আমি এবং আমাদের দুই ক্ষুদে ধ্রুপদ ও তাথৈ।

সকাল ন'টা নাগাদ জয়পুর পৌঁছে গেলাম। পিঙ্ক সিটিতে ঢোকার ঠিক আগে অম্বর ফোর্টের লাগোয়া একটা রিসর্টে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা ছিল। সেখানে পাশাপাশি দুটো ঘরে আমরা ঢুকে গেলাম। সামনেই লম্বা দেয়াল জুড়ে জানালা। পরদা সরাতেই অম্বর ফোর্ট। আহ!! এই সেই বহু ইতিহাস বিজড়িত ফোর্ট– এখানেই রাজকন্যা যোধা থাকতেন। সিনেমার (যোধাআকবর) ব দৌলতে রাজকন্যা যোধা আমাদের অত্যন্ত চেনা চরিত্র।

জুন মাসে রাজস্থানে খুব গরম। তাই দুপুরে কোথাও বেড়াতে গেলাম না। তবে ঘরে বসে থাকতেও ইচ্ছে করছিল না। সবাই মিলে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে খেয়ে গাড়িতে ঘুরে ঘুরে শহরটা ভাল করে বুঝে নিতে চেষ্টা করলাম। ভারতের প্রথম পরিকল্পিত নগর এই পিঙ্ক সিটি। সোজা রাস্তার দু'ধারের বাড়িগুলো সব গোলাপী রঙের। রাস্তার ধারের দোকানগুলোও সব একই আকৃতির। তাদের নামফলকও একই রকমের। বাড়ির গায়ে নানা চিত্র। এগুলো আমাদের বাঙলার পটচিত্রের আদলে দেখে খুব অবাক হলাম। সুতনু নিজে স্থপতি হওয়ায় আমাদের বলল, বাঙালি স্থপতি বিদ্যাধর ভট্টাচার্যের নকশায় শহরটি তৈরি হয়েছিল।

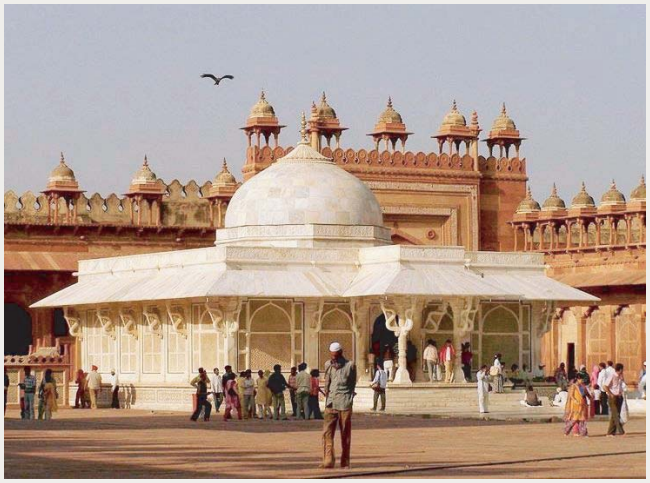

১৭২৭ সালে রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ শহরটি গড়ে তোলেন। জয়পুর এখন রাজস্থানের রাজধানী। হাওয়ামহল ও জলমহল দেখে আমাদের খুব ভাল লাগল। রাজপুত রাজারা তাঁদের কাজের জন্যই দেশের লোকের কাছে, প্রজাদের কাছে এখনো শ্রদ্ধেয়, পূজনীয়। এই মরুভূমির দেশ রাজস্থানেও তাঁরা জলাধার বানিয়েছেন, শক্ত পাথরের পাহাড় কেটে দুর্গ বানিয়েছেন।

রাজস্থানের পরতে পরতে ঐতিহাসিক গল্প। রাজস্থান মানেই অবনীন্দ্রনাথের *রাজকাহিনী*। রাজসিংহাসন রক্ষার জন্য কত ভাইয়ে ভাইয়ে বিচ্ছেদ, কত রক্তপাত, কত অশ্রু বিসর্জন। সেইসব যুদ্ধ ও রাজাদের বীরগাথা সমস্ত রাজপুতের প্রাণে এখনো সোনার অক্ষরে লেখা। এঁদের একজন হলেন মহারাজ খোমান , আশীর্বাদ করতে হলে এখনো যাঁর নাম করে রাজপুতেরা বলেন– 'খোমান তোমায় রক্ষা করুন'।

চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে 'পদ্মিনী'র কাহিনি। আলাউদ্দীন লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে চিতোর আক্রমণ করেছেন। তিনি ভেবেছিলেন যাব আর পদ্মিনীকে কেড়ে আনব। কিন্তু এসে দেখলেন, বুকের পাঁজর প্রাণের চারদিক যেমন ঢেকে রাখে, তেমনি রাজপুতের তলোয়ার পদ্মিনীর চারদিকে দিবারাতি ঘিরে রয়েছে। বহু প্রচেষ্টা, ষড়যন্ত্র, বার বার আক্রমণের পর চিতোর জয় হল, কিন্তু হায়! পদ্মিনীকে আর পাওয়া গেল না। মহারানী পদ্মিনী রাজপুরীর নারীদের নিয়ে আত্মসম্মান রক্ষার্থে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়েছেন। আজও চিতোরে মহাসতীর শ্মশানে পদ্মিনীর সেই চিতাকু- দেখা যায়। রাজস্থানের বীরগাথা, মূল্যবোধের ইতিহাস অফুরন্ত। আমরা সেদিন পিঙ্ক সিটিতে ঘুরে বেড়ালাম, আর এরকম বহু ঐতিহাসিক ঘটনা আলোচনা করে মনটাকে রাজস্থানের জন্য প্রস্তুত করে নিলাম। পরদিন সকালে আমরা গেলাম 'সিটি প্যালেস' দেখতে। এই প্রাসাদটি সমতলে গড়ে উঠেছে। প্রাসাদের একাংশে এখনো রাজ পরিবারের বসবাস রয়েছে। রাজাদের ব্যবহৃত বহু আকর্ষণীয় জিনিসপত্র দেখলাম। অনুষ্ঠানের জন্য রয়েছে বিশাল বাঁধানো চাতাল। তার চারদিকে চার ঋতুর সাজে সুসজ্জিত তোরণ। যেমন বর্ষা ঋতুর অনুষ্ঠানে রাজারানী ময়ূরতোরণে এসে বসতেন। এইরকম আরো অনেক সুরুচিসম্পন্ন জিনিসপত্র দেখলাম। তবে সেদিন রোদ্রেগর মে আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমাদের সঙ্গে রয়েছে দুই ও সাড়ে তিন বছরের দুই ক্ষুদে। তাই সেদিন আর কোথাও গেলাম না। ঠিক করলাম, আনন্দ করে বেড়াব, কম সময়ে অনেক স্থান দেখে নেবার চেষ্টা করব না।

জয়পুরে রয়েছে তিনটি দুর্গ– জয়গড়, অম্বর ও নাহারগড়। তিনটিই পাহাড়ের মাথায়। জয়গড়ে রয়েছে বিশাল কামান 'জয়বান'। ভেতরে প্রাসাদ মিনার আজও রয়েছে। নাহারগড় প্রাসাদের চিত্রকলার কাজ নজর কাড়ে। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় অম্বর ফোর্ট। মাওটা হ্রদের ধারে, টিলার গায়ে তৈরি এই দুর্গে ছিল জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী। প্রাসাদ, মহল, প্রাচীর আজও অক্ষত রয়েছে। রয়েছে সংগ্রহশালা। দুর্গের মধ্যেই রয়েছে শীলামাতার মন্দির। আমরা যখন গেলাম, সবে সকালের পুজো শেষ হয়েছে। আমরা তাঁর প্রসাদ পেলাম। পরে ফোর্টের ভিতরে হাতির পিঠে চড়লাম।

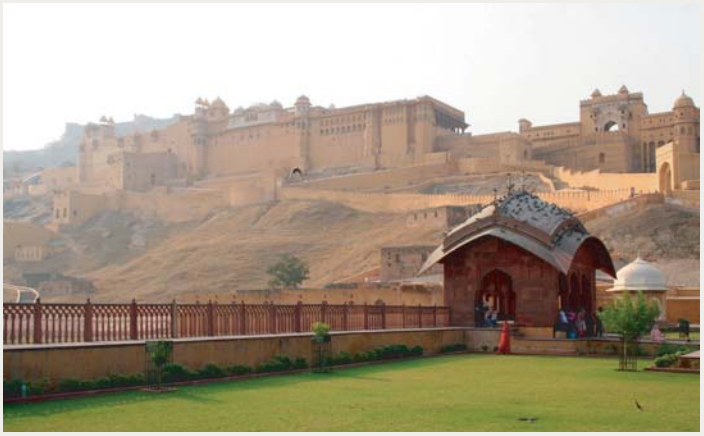

বিকেলে গেলাম চৌকিধানী দেখতে। কী যে আনন্দ হুল্লোড় সেখানে হল, যতই বলি কম বলা হবে। রাজস্থানের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য এই কৃত্রিম গ্রামটি সাজানো। সবাই মিলে অনেক খেলাধূলা হল। ভুল ভুলাইয়াতে আমরা সবাই হাত ধরাধরি করে ঢুকলাম, যেন কেউ আলাদা হয়ে না যাই। যথারীতি আমরা সুড়ঙ্গ ভেদ করে, গোলক ধাঁধা জয় করে পাঁচজন এক দরজা দিয়ে বাইরে এলাম, কিন্তু সুতনু নেই। মোবাইল ফোনের কল্যাণে একসঙ্গে হলাম, তবে খানিকটা সময় লাগল। একটা পুকুরে বিশাল এক কুমির ছিল। দিদি দুই ছোটকে নিয়ে কুমিরের পিঠে চড়ে বসল। এক জায়গায় দামণি খাটিয়ায় বসে হুঁকোয় টান দিল। প্রচুর মজার মজার ছবি তোলা হল। নৌকোয় চড়া, দোলনায় চড়া, স্লাইডে চড়া, ভৌতিক গ্লুছমছ মে গুহায় ঢোকা... আরো অনেক আনন্দ হল। আমি ও দিদি আত্মীয়পরিজন, ব ন্ধুবা ন্ধব সবার জন্য কিছু কিছু জিনিস কিনলাম। সবশেষে সেখানকার খাবার খাওয়া। তাঁরা নতুন নতুন স্বাদের অনেক খাবার পরিবেশন করলেন। শুধু তাই নয়, সামনে দাঁড়িয়ে থেকে সেগুলো খাওয়ার বিশেষ পদ্ধতিও আমাদের বলে দিচ্ছিলেন। বাজরা, ভুট্টা, আটার রুটি, ডাল্লবাট্টিচুম ী, বিভিন্ন স্বাদের ও রঙের নানা মুখরোচক খাবার, মিষ্টি, লস্যি আমাদের দেওয়া হল। সে এক মহাভোজ! খাওয়ার পর খোলা আকাশের নীচে খাটিয়ায় শুয়েব সে আমরা পূর্ণিমার মস্ত চাঁদের সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। প্রচুর রাতের গান, চাঁদের গান গাইলাম। ছোটদের চোখে তখনো ঘুম নেই। রাত ১২টায় সেখান থেকে বেরিয়ে আমাদের হোটেলে ফিরে এলাম। এসেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুতে চলে গেলাম।

পরদিন অর্থাৎ ২৫ জুন সাড়ে ছ'টায় রিসর্ট ছেড়ে রওনা হলাম যোধপুরের দিকে, পথে আজমির, পুষ্কর দেখে নেবার পরিকল্পনা হল। প্রায় ঘুমন্ত পিঙ্ক সিটিকে বিদায় জানিয়ে আমরা বেরিয়ে গেলাম ঠিকই, তবে প্রচুর প্রচুর ভাললাগা সঙ্গে নিয়ে এলাম। আমাদের ড্রাইভার বেচারার অবশ্য পিঙ্ক সিটির সঙ্গে একটুও বন্ধুত্ব হয়নি। এখানে ট্রাফিক রুল খুব কড়া। বারবার পুলিশ এসে গাড়ির কাগজপত্র মিলিয়ে দেখে। ড্রাইভার একটি কাগজ দিল্লিতে ফেলে আসায় তাকে বারবার ফাইন দিতে হচ্ছিল। দামণি তখন গাড়ির মালিকপক্ষকে কাগজটা স্ক্যান করে মেইল করে দিতে বলল। তারপরে আর তাকে ঝামেলায় পড়তে হয়নি। ড্রাইভার খুশি হয়ে দামণিকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছিল।

আজমিরের পথে...

সপ্তম শতাব্দীতে রাজা অজয় পাল চৌহান আজমির নগরীর পত্তন করেন। ১১৯৩ সাল পর্যন্ত এখানে চৌহান বংশের রাজারা রাজ্যপাট চালান। রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান মহম্মদ ঘোরির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হলে চৌহানরা ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। আজমির মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের তীর্থভূমি। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য দরগা শরীফ। এটি সুফি খাজা মইনুদ্দিন চিশতির দরগা। প্রতিবছর সম্রাট আকবর আগ্রা থেকে তীর্থযাত্রীদের নিয়ে এখানে আসতেন।

শহরের অলিগলি পেরিয়ে আমরা দরগায় পৌঁছলাম। প্রবেশদ্বারটি বিশালাকার ও শিল্পমণ্ডিত– হায়দ্রাবাদের নিজাম এটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। আমরা দরগায় পৌঁছে থাল্লিচাদর কি নে, মাথা ঢেকে, খালি পায়ে ভেতরে ঢুকলাম। শান্তমনে সকলের মঙ্গল কামনা করে চাদর চড়িয়ে বেরিয়ে এলাম। দুপুর রোদে দরগার চাতাল তেতে উঠেছে, পা রাখা যাচ্ছে না। তারপরও সেখানে প্রচ- ভিড়। দেশ্লবি দেশ থেকে প্রচুর মানুষ এসেছেন প্রার্থনা জানাতে। তাই বেশিক্ষণ দাঁড়ানোর সুযোগ ছিল না।

দরগার খুব কাছেই দেখে নিলাম 'আড়াই দিন কা ঝোপড়া'। এই

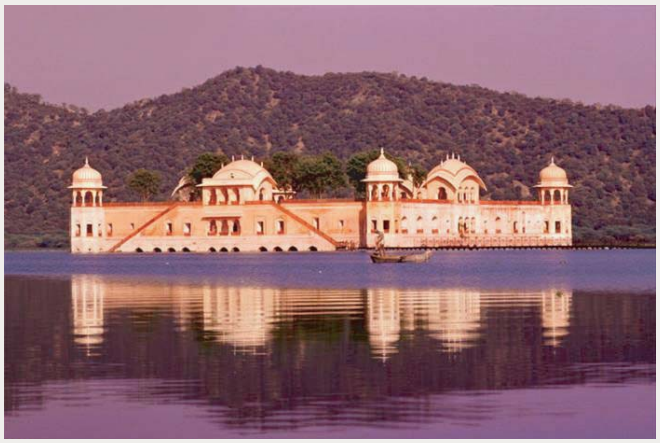

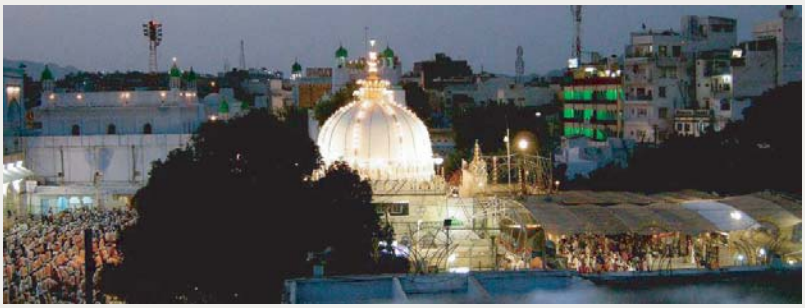

স্থাপত্যটি মন্দির ও সংস্কৃত কলেজ ভেঙে আড়াই দিনে বানিয়েছিলেন মহম্মদ ঘোরি। এখন এটি একটি মসজিদ।

এরপর পুষ্কর...

হিন্দুতীর্থ পুষ্কর আজমির থেকে মাত্র ১১ কিলোমিটার দূরে। আজমির থেকে নাগ পাহাড় পেরিয়ে যেতে হয় পুষ্করে, নাগ পাহাড়ের সংস্পর্শে এসে আমরা রাজস্থানের ভূপ্রকৃতির বিশেষত্ব টের পাচ্ছিলাম। দিদি উদ্ভিদ বিজ্ঞানী– তাই আমাদের বলে দিচ্ছিল সেখানকার জলবায়ুতে কেন বাবলাফণিমনসার ঝোপ দেখা যায়। এই জলশূন্য মাটিতে গাছেরা তাদের পাতার জলকে বাষ্পীভূত হতে দিতে চায় না। তাই অভিযোজনের পথে পাতার প্রান্তদেশ কাঁটায় পরিণত হয়েছে। আমরা বাকিরা আমাদের স্কুলের পড়া ঝালিয়ে নিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম পুষ্করে।

কিংবদন্তি আছে, ব্রহ্মার হাত থেকে পদ্ম ফুল পড়ে সৃষ্টি হয় পুষ্করের পবিত্র সরোবর। এটি ব্রহ্মার যজ্ঞস্থল ছিল। হ্রদের গায়ে রয়েছে দেশের একমাত্র ব্রহ্মা মন্দির। প্রতিবছর কার্তিক পূর্ণিমায় এখানে ১০ দিন ধরে মেলা ও পুণ্যস্নান চলে সরোবরের জলে। পুষ্করের দু'টি পাহাড়ের মাথায় রয়েছে সাবিত্রী ও গায়ত্রী দেবীর মন্দির। হ্রদের ধারে প্রায় ৫০টি বাঁধানো ঘাট রয়েছে। স্বচ্ছ ঝকঝকে বিস্তৃত এই জলাধার দেখেই মন বলে উঠল 'শান্তির বারি'। শীতকালে এই হ্রদের জলে রঙ্গ বেরঙের পাখি আসে। রাম যখন বনবাসে, তখন রাজা দশরথের মৃত্যু হয়। কথিত আছে, রামচন্দ্র এখানে এসে এই পুণ্য সরোবরে পিতৃ শ্রাদ্ধ, অর্পণ ও পিণ্ডদান করেছিলেন। সেই থেকে এখানে পিতৃপুরুষের পি-দানের প্রথা প্রচলিত।

যোধপুরের পথে...

আজমিরপুষ্কর দেখে আমরা আনন্দচিত্তে গাড়িতে চড়ে বসলাম। বলা বাহুল্য, আমরা ছয়জন, আমাদের ড্রাইভার, আর আছে নানা আকার আয়তনের ব্যাগ, যা এই ক'দিনে ক্রমশ বেড়েই চলেছে, ডিকি বোঝাই হয়ে ওরা অনেকেই তখন আমাদের সঙ্গে সিট ভাগাভাগি করছে। একটানা গাড়িতে বসে থাকতে হলে বাচ্চাদের জন্য অনেক রকম আকর্ষণীয় জিনিস সঞ্চিত রাখতে হয়। এ ব্যাপারে দিদির বিশেষ পারদর্শিতা। ছোটবড় যখন যার যা দরকার হচ্ছিল দিদি মুহূর্তেই বলে দিচ্ছিল 'লাল ব্যাগের ডানদিকের পকেটে অ্যালফাবেট বুক রাখা আছে' কিংবা 'নীল ব্যাগের সামনের চেইনে ওই ওষুধটা রাখা আছে' ইত্যাদি। আমরাও চোখ বন্ধ করে যার যা দরকার পেয়েও যাচ্ছিলাম। তাই সেদিন সুতনু দিদিকে 'ব্যাগ বাহাদুর' খেতাবে ভূষিত করল। রাস্তা শেষ হচ্ছে না দেখে আমরা ছোটদের উদ্দেশ্যে কাউন্টিং মাংকির গান (অবশ্যই স্বরচিত) শুরু করলাম। আসল গানটিও খুবই মজার।

ওয়ান লিটল মাংকি সেলিং আইসক্রিম
হোয়েন এনাদার কামস্ উইথ এ্লস্ ক্রিম
'কাম ডিয়ার মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড জয়েন উইথ মি'
শাউট এ্লাউড দি লিটল মাংকি –
নাউ দেয়ার আর টু মাংকিস!

এইভাবে বিভিন্ন কাজে যুক্ত হতে হতে ১০৮টা মাংকির আগমন হল। বলাবাহুল্য, ছোটরা খুবই আনন্দ পেয়েছিল, কিন্তু তবু রাস্তা শেষ হচ্ছে না।

এই দিনটি ছিল আমাদের যাত্রাপথের সবচেয়ে উদ্বেগের দিন। আমরা শুনেছিলাম, আজমির থেকে যোধপুর যেতে আমাদের তিন ঘণ্টা লাগবে, কিন্তু দেখা গেল চাকা ঘুরেই চলেছে– গন্তব্য তখনো অনেক দূর। ওখানে রাত ৮টাতেও দিনের আলো থাকে। একসময় দিনের আলোও নিভে গেল। আমরা গুগল ম্যাপে রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করছি। এবার আমরা একদম গ্রামের মেঠো রাস্তায় চলে এসেছি। চারপাশে প্রচুর ময়ূর। আমাদের শহরে যেমন কাকের আধিপত্য, এখানে তেমনি ময়ূর। চারিদিকে 'উট চলেছে মুখটি তুলে...' অথচ কোন জনমানব নেই যে রাস্তা জিজ্ঞেস করব। আমাদের দুই ক্ষুদে সকাল থেকে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেছে। আরো কিছুক্ষণ গভীর অন্ধকারে অনিশ্চিত পথে চলতে চলতে মহাসড়কে এসে উঠলাম এবং প্রচুর জিজ্ঞাসাবাদের পর আমাদের গন্তব্য চূর্ণালুনী ফোর্টে পৌঁছলাম। এই ফোর্টেই আমাদের

থাকার ব্যবস্থা। তখন রাত প্রায় দশটা। ঢুকেই দেখলাম ফোর্টের বিশাল চাতালে রাজস্থানী লোকজ নাচগান পরি বেশিত হচ্ছে। আমাদের সবার মন ভাল হয়ে গেল। দিনে প্রচুর প্যাকেটখাবার গলাধঃকর ণের পর রাতে ফোর্টের রেস্টুরেন্টে বাঙালির চির পরিচিত খিচুড়ি খেলাম। প্রচ-ক্লান্তি ও খিদের দাপটে সেদিন খাবারটা যে কী সুস্বাদু মনে হয়েছিল তা বলার নয়।

২৬ জুলাই সকালে ঘুম ভাঙল পাখির ডাকে। দরজা খুলে বারান্দায় এসে দেখি চারিদিক কী সবুজ কী সবুজ! চোখ জুড়িয়ে যায়। এটি একটি পুরনো কেল্লা, অনেক উঁচু পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। সামনেই বিশাল উঠোন, তাতে ছোট করে কাটা সবুজ ঘাস। একদিকে উঁচু দেওয়াল থেকে ঝুলে রয়েছে প্রচুর সবুজ লতানে গাছ, তারা ভোরের প্রথম সূর্যকিরণে শিহরিত হয়ে কেঁপে উঠছে, চিকচিক করছে যেন ঝরনার জল গড়িয়ে নামছে। আমরা সবাই মিলে উঠোনে টেবিল্ চেয়ারে বসে কফি খেতে খেতে খোলা গলায় রবীন্দ্রনাথের গান গাইলাম। ধ্রুপদ আর তাথৈ দৌড়োদৌড়ি করে বিশাল কেল্লার আনাচে কানাচে দেখে নিল কোথায় দোলনা আছে, কোথায় আছে সাঁতারের জলাধার।

লুনী ফোর্টটি মূল যোধপুর শহর থেকে ১৮ কিমি দূরে। আমরা সবাই তৈরি হয়ে যোধপুরে গেলাম। সেদিন যথেষ্ট রোদ উঠেছিল, তাই আর অন্য কোথাও বেড়াতে গেলাম না। এই ক'দিনে আমাদের মজুদ খাদ্য ভা-ার কমে এসেছিল, তাই একটা 'বিগ বাজার'এ নেমে প্রচুর খাবার দাবার ও খেলার জিনিস কিনে ফোর্টে ফিরে এলাম। বিকেলে রোদ কমে গেলে সবাই মিলে ফোর্টের উঠোনে বল নিয়ে খেললাম। ধ্রুপদ্রতা থৈ নতুন লাল হলুদ বল পেয়ে মহা খুশি।

যোধপুরকে বলা যায় রাজস্থানের মরু অঞ্চলের প্রবেশদ্বার। যোধপুর, জয়সলমির, বিকানির নিয়ে গড়ে উঠেছে রাজস্থানের বিখ্যাত ডেজার্ট সার্কিট। ১৪৫৯ সালে যোধপুর প্রতিষ্ঠা করেন রাও যোধা। ঐতিহাসিক এই শহরের মুখ্য দ্রষ্টব্য শহরের বুকের উপর টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে দুর্ভেদ্য দুর্গ মেহরানগড়। ২৭ তারিখ সকালে আমরা সেখানে গেলাম। শহরের সব প্রান্ত থেকেই দুর্গটি দেখা যায়। দুর্গটি ৫ কিমি লম্বা। দুর্গের মধ্যে রয়েছে মোতিমহল, ফুলমহল, শিসমহল, শিলেখানা, দৌলতখানা প্রভৃতি দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদপুরী। প্রাসাদগুলো এখন জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। ফোর্টের একদম উপরে উঠলে পুরো যোধপুর শহরকে খুব সুন্দর দেখায়। ফোর্টের লাগোয়া 'ব্লু সিটি'। সেখানকার সব বাড়ি নীল রঙ করা। গরমে আরাম পাবার জন্য এখানে তুঁত গাছের রঙে রঙিন করা হয়েছে বাড়ির দেয়াল। পাহাড়ের উপর দোতল্যাতিনতলা এই বিশাল কেল্লা দেখতে দেখতে আমরা এক্সিট পয়েন্টে চলে এলাম। সেখানে একটি বিশাল কামান রাখা আছে। বেরোবার মুখে একজন খুব সুন্দর গলায় রাজস্থানী লোকসংগীত গেয়ে শোনালেন। সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা ১৮৯৯ সালে তৈরি মহারাজ দ্বিতীয় যশোবন্ত সিংএর সমাধিমন্দির 'যশোবন্ত থাডা' দেখতে গেলাম।

রাজস্থানের মানুষ তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। একই সঙ্গে রক্ষণশীলও বটে। ওখানে সব বয়সী ছেলেমেয়ে প্রতিদিন তাদের আঞ্চলিক পোশাক পরে। মেয়েরা ঘাগড়া চোলি আর ছেলেরা ধোতিপা গ্লারিপাগড়ি। ওখা নে অধিকাংশ লোকই নিরামিষাশী। তবে 'লালমাস' নামে বিশেষ এক রকমের মাংসের পদ তাদের ভাল খাবারের তালিকায় দেখা যায়। আমরা সেদিন দুপুরে এই বিশেষ মাংসের খাবারটি খেলাম।

যোধপুর স্টোন্নজু য়েলারির জন্য বিখ্যাত। আমরা আগেই গুগলে দেখেছিলাম ওখানে কুন্দনের গয়না বেজায় সস্তা। আমরা কিছু গয়না কিনলাম।

২৮ তারিখ সকালে আমরা 'উমেদ ভবন' প্রাসাদে গেলাম। শহরের এক প্রান্তে রয়েছে এই দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদ। এখানে এখনো রাজ পরিবারের বসবাস রয়েছে। প্রাসাদের একাংশে হোটেল ও অপরাংশে রয়েছে জাদুঘর। রাজা উমেদ সিং ১৯৪২ সালে এই প্রাসাদ তৈরি করেন। ফলে এই প্রাসাদে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন চোখে পড়ার মত।

জয়সলমির যাবার খুব ইচ্ছে ছিল আমাদের, কিন্তু সময়াভাবে যাওয়া হল না। তাই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে গেলাম 'ওশিয়ান' নামের একটি জায়গায়। বিশাল অঞ্চল জুড়ে শুধু ছোট বড় ঢেউ খেলানো বালির সমুদ্র। সোনার কেল্লা না দেখার দুঃখটা অনেকটাই ভুলিয়ে দিল এই বালিয়াড়ি। বিশাল লম্বা লম্বা উট চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমরা হীরা ও মোতি নামের দুটো উটের পিঠে চড়ে সূর্যাস্ত দেখলাম। উটের পিঠে চড়ার অভিজ্ঞতাটাও অসাধারণ। উটেরা বালিয়াড়িতে কখনো টিলার উপরে উঠছে, কখনো নামছে। সেই ওঠানামা খেয়াল রেখে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অনুযায়ী আমাদেরও সামনে বা পেছনে কাত হতে হচ্ছিল। আমরা মহানন্দে উটের গলা জড়িয়ে ধরে ছবি তুললাম। সেদিনও প্রচুর ময়ূর দেখলাম। কারো বাড়ির ছাদে ময়ূর পেখম ছড়িয়ে আনন্দ করছে, আবার কখনো ব্যস্ত ময়ূর আমাদের গাড়ির সামনে দ্রুত রাস্তা পার হচ্ছে। আমরা সবাই গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি আর বলছি 'দ্যাখো দ্যাখো এই ময়ূরটা পেখম ছড়িয়েছে'। প্রকৃতির সৌন্দর্যকে আকণ্ঠ পান করে ফোর্টে ফিরে এলাম।

এবার ঘরে ফেরার পালা। তাই সবাই যে যার জিনিস ব্যাগে ঢোকাতে শুরু করলাম। পরদিন সকালে উঠে ব্যাগ্যট্ যাগ গাড়িতে তুলে আমরা ফোর্টের ভিতরে ঘুরে বেড়ালাম। সবারই মন কেমন করছিল। ধ্রুপদ্রতা থৈএর এই ক 'দিনে অনেক বন্ধু হয়ে গেছে, অধিকাংশই ফোর্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী। তাই ভাই বোনে মিলে ফোর্টে থেকে যেতে চাইছিল। ওদের রাজপুত কাক্মা জ্যেঠুরা আমাদের ফোর্টের সিংহদ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দিল। ধ্রুপদ্রতা থৈকে অনেক ফুল উপহার দিল।

বিদায় লুনী ফোর্ট, বিদায় যোধপুর, বিদায় রাজস্থান বলতে বলতে আমরা এগিয়ে চললাম দিল্লির উদ্দেশ্যে।

শ্রুতি নাহা সেন
ভারতের সংগীতশিল্পী, ভ্রমণলেখক

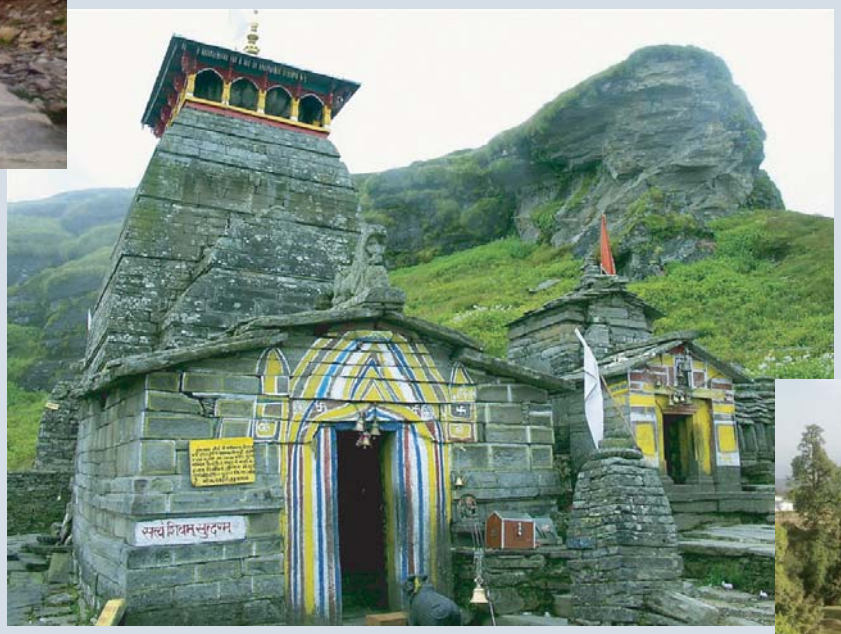

ভ্রমণ

তুঙ্গনাথে দ্বিপ্রহর

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

ভ্রমণের নাম চরৈবেতি। চরৈবেতি মানে থেমে না থাকা। চলতে চলতে একে একে পেরোলাম হরিদ্বার, দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ। তারপর আরো নীচে নেমে তিলওয়াড়া হয়ে গুপ্তকাশীর পথে। চলল মন্দাকিনীর ধারা। তবে ঊষার শুকতারা নেই। গাড়োয়াল হিমালয়ের কোলে তখন সূর্য ঢলি ঢলি। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে ১৮ কিমি দূরে পড়ল অগস্ত্যমুনি। এখানে ঋষি অগস্ত্য তপস্যা করেছিলেন। মন্দাকিনীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা শেষ। জায়গাটা বেশ সমতল। চাষাবাদও বেশ হয়েছে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা হাসিমুখে বাড়ি ফিরছে তখন। তন্বী শিখরা গৌরী গাড়োয়ালী যুবতী, পিঠে বিশাল ঝুড়ি। গুপ্তকাশী পৌঁছনো হল সেই বিকেলে। হোটেল সাদামাটা কিন্তু পরিচ্ছন্ন। আসামাত্রই ধূমায়িত আদা-চা। রাতে গরম রন্নটি, সবজি আর ডাল।

গুপ্তকাশীর ভোর ছিল বড় সুন্দর। ঘর থেকে গাড়োয়াল হিমালয় দেখলাম দু'চোখ ভরে। পাহাড়ের কোলে ছোট্ট পুরনো শহর গুপ্তকাশী। প্রাতঃরাশ, স্নান সব সেরে নিয়ে সকাল সাতটায় আমাদের যাত্রা শুরু হল চামোলি জেলার চোপতার পথে। গাড়ি যেই চলতে শুরু করল পাহাড়ের মাথায় বরফ দেখে আমরা যারপরনাই উত্তেজিত। রোদ উঠে গেছে ততক্ষণে আর পাহাড়ের বরফচূড়া সেই আলোয় রূপোর মত চকচক করছে। এ দৃশ্য কখনো পুরনো হয় না। স্থানকালপাত্র ভেদে অবর্ণনীয়। অমোঘ এই আকর্ষণ। ভাষাতীত এই সৌন্দর্য। মন্দাকিনীর ওপরে সেতু পেরিয়ে বরফচূড়ায় চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে এগোতে লাগলাম। যত গাড়ি পাহাড়ের ওপরে উঠছে, তত তাপমাত্রা কমছে। ইতোমধ্যে ডেসিডুয়াস থেকে কোনিফেরাস গাছের ট্রানজিশন শুরু হয়েছে। পাইন, ক্যাসুরিনা সরতে শুরু করল আর আমরা

ক্রমশ এলপাইন অঞ্চলে প্রবেশ করতে লাগলাম। প্রকৃতি হিমালয়ময়। পাহাড়ের গায়ে এলোপাথাড়ি ফার্ন আর মসের চাদর। বড় গাছ খুব কম। নির্জন নিথর সৌন্দর্য। পাহাড়ের গায়ে লুকনো ঝোরার কলকল শব্দ আর অবলীলায় ঝরে পড়া। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমাদের গাড়ি চলল কিছুটা। আবার কিছুটা খোলামেলা আলোপথ। রুদ্রপ্রয়াগের চিতার পায়ের ছাপ হয়তো বা পড়েছিল এই জঙ্গলে। গুপ্তকাশী থেকে চোপতার পথ ৪৫ কিমি। আরো চড়াই পথ। যত এগিয়ে এল চোপতা ততই পথ দুর্গম থেকে দুর্গমতর হল। সরু রাস্তা। গাড়ির পথটুকুও ভয়ানক দুর্গম। পায়ে হাঁটা তুঙ্গনাথের পথ আরো কত দুর্গম হবে সেই ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম। অবশেষে চোপতা এল সময় মতন। গাড়ি নীচে রেখে সকাল দশটায় চোপতা থেকে আমাদের হাঁটা শুরু তুঙ্গনাথের পথে। বাঁধভাঙ্গা আনন্দের উচ্ছ্বাস আর মনের জোর নিয়ে; কেদারনাথের উচ্চতা ১১,৭৫০ ফুট আর তুঙ্গনাথের উচ্চতা ১২,০৭০ ফুট। তুঙ্গনাথ পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিব মন্দির। তুঙ্গনাথ পঞ্চকেদারের একটি। চোপতা থেকে পায়ে হেঁটে তুঙ্গনাথ যেতে সময় লাগে আড়াইঘণ্টা। যাত্রা শুরু করলাম। সঙ্গে গুকোজ বিস্কিটের প্যাকেট আর জল।

পর্যটকের সংখ্যা মেরেকেটে জনাকুড়ি হবে। তাও আসামাওয়া মিলি য়ে। তার মধ্যে বাঙালি পর্যটকই বেশি। পাথরের বাঁধানো ধাপকাটা পথ কিন্তু শুরু থেকে চড়াই। কেদারনাথে পথ খুব বিপদসঙ্কুল– একপাশে খাদ আর অন্যদিকে পাহাড়ের গা। কিন্তু শুরু থেকে শেষ অব্দি অতটা চড়াই নয়।

তুঙ্গনাথের পথ শুরু থেকে চড়াই ফলে কিছুদূর গিয়েই মনে হয় আর পারব না পৌঁছতে, দম ফুরিয়ে যায়। অক্সিজেন কম পড়ছে বোধ হয়। ফুসফুস আর টানতে পারছে না। কিছুটা চলি তো আবার বসে বিশ্রাম করি পাহাড়ের গায়ে। নির্জনতা আমাদের সঙ্গী আর অদম্য মনের জোর আমাদের পাথেয়। শব্দ বলতে দাঁড়কাকের আওয়াজ আর দু'একজন ঘোড়ারোহীর কৃপায় ঘোড়ার গলার টুংটাং, আর রডোডেনড্রনের শুকনো পাতার টুপটাপ ঝরে পড়ার শব্দ। মিষ্টি লাগে শব্দটা কিন্তু পথের ক্লান্তিতে সেটাও উপভোগ করতে কষ্ট হল। চোপতা থেকে ৩৫০০ ফুট উঠতে হবে এমন চড়াই পথ বেয়ে! একবার ভেবেছিলাম ঘোড়া নেব কিন্তু কেদারনাথ ঘোড়ায় গিয়ে দেখেছিলাম ঘোড়ায় বসে কেবলি মনে হয় এই বুঝি সে পড়ে যাবে, আমি খাদে পড়ে যাব। নিজে হাঁটলে প্রকৃতির রূপরস বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা যাবে, তাই পায়ে হাঁটা। মনে পড়ছে দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে... যেমন করেই হোক আমাকে পৌঁছতে হবেই। মনে পড়ল সেই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাব। কখনো ভাবছি শঙ্করাচার্যের কথা। তিনি সেই যুগে পায়ে হেঁটে কত তীর্থ ঘুরেছিলেন, ধাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা তো তার একলক্ষ ভাগের একভাগও তীর্থ করছি না। পায়ের কষ্ট নেই। ভাল জুতো পরা আছে, শীতের কষ্ট নেই, গায়ে পর্যাপ্ত জামাকাপড় আছে কিন্তু হৃদয় আর শ্বাসযন্ত্র যে বড় সুখী আমাদের। সমতলীয় গঙ্গাতীরে জন্মকর্ম আমাদের। পাহাড়ের চড়াই অতিক্রমে শ্বাস ফোলে ঠিক ব্যাঙের স্বরযন্ত্রের মত। পথের ক্লান্তি ভুলে থামলাম একটি চটিতে। সেখানে চা খেয়ে আবার চলা। আবার চেয়ে দেখি পাহাড়ের পানে। ঠাঁই নেই সেখানে বৃক্ষরাজির; এলপাইন অঞ্চল। কিছুটা পাহাড় আবার কিছুটা সবুজ ঘাস বিছানো সমতল আর পাশ দিয়ে পাকদণ্ডী হয়ে উঠে গেছে তুঙ্গনাথের পথ। কিছুদূরে গাড়োয়াল বিশ্ববিদ্যালয় বা হেমবতী নন্দন বহুগুণা ইউনিভার্সিটি; সেখানে এলপাইন ট্রি রিসার্চ সেন্টার। দূরে কস্তুরীমৃগদের সংরক্ষণশালা। চড়ছি আরো, মাঝপথে বরফের চাঙড় দেখে মনটা বেশ খুশিখুশি হল। একটু জল খাচ্ছি, আবার হাঁটছি। দূর থেকে তুঙ্গনাথের মন্দিরের বিশাল ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে আসছে। বুঝলাম কাছাকাছি এসে পড়েছি। মনের জোরে শেষমেশ পৌঁছলাম তুঙ্গনাথ ১২,৫০০ ফুট উচ্চতায়। বেশ হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা ওপরে। মেঘলা আকাশ। রোদের প্রখরতা এক্কেবারে নেই। দু'এক ফোঁটা বৃষ্টিও ঝরল গায়ে। তবে ওপরে পৌঁছে মন্দিরের বিশাল হলুদ ধ্বজা দেখতে পেয়ে মনে বড় আনন্দ হল। মন্দিরচত্বরে যত্রতত্র তুষারপাত হয়েছে। ঘটি সঙ্গে ছিল। বাবা তুঙ্গনাথকে দর্শন করে জল ঢাললাম তাঁর মাথায়। নিজে নিজেই মন্ত্র বলে পুজো করলাম। পাশেই পার্বতী মন্দির যার পুরুষ হলেন স্বয়ং তুঙ্গনাথ, প্রকৃতি যার পার্বতী– যে পুরুষ ও প্রকৃতির সমন্বয়ে এই দুনিয়া ভাঙছে আর গড়ছে অবিরত।

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়
ভারতের ছোট গল্পকার, ভ্রমণলেখক

ভ্রমণ

সিকিম ভ্রমণ

জ্যোতিবিকাশ বড়ুয়া

বাংলাদেশ থেকে বেরুবার সময় ভ্রমণ পরিকল্পনায় সিকিম ছিল না। ছিল শুধু দার্জিলিং ও তার আশপাশ যেমন মিরিক, ঘুম, কালিম্পং ও মংপু বেড়ানো। এসব জায়গা ঘুরে দেখতে যা ধারণা করেছিলাম তার চেয়ে দু'দিন সময় কম লাগায় সিদ্ধান্ত নিলাম সিকিমটাও এক-চক্কর মেরে দেখা যাক। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মাথার উপরে কিরীটসদৃশ পূর্ব-হিমালয়ের অনিন্দ্যসুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ সিকিম। এককালের স্বাধীন বৌদ্ধরাজ্য সিকিম আকার ও ক্ষমতা হারিয়ে বর্তমানে ৭,০৭৬ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ভারতের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য। রাজধানী গ্যাংটক। দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলা, পশ্চিমে সিঙ্গলীলা পর্বতশ্রেণি ডিঙিয়ে নেপাল, উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তিব্বত, পূর্বে চুম্বি উপত্যকা পেরিয়ে তিব্বত ও ভুটান। পুরো রাজ্যটাই পাহাড়ী, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এলাকাভেদে উচ্চতা ৭৫০ থেকে ২৮,৩৫০ ফুট। সর্বোচ্চ পয়েন্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশৃঙ্গ। উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে চলেছে তিস্তা নয়নলোভা প্রকৃতির মাঝ দিয়ে। এছাড়া আছে অসংখ্য বরফগলা জলের স্রোতধারা। সিকিমে রয়েছে ২৮টি পর্বতশৃঙ্গ, ২১টি হিমবাহ, ৮টি গিরিপথ, ৫টি উষ্ণ প্রস্রবণ ও ২২৭টি পার্বত্য হ্রদ, যার মধ্যে আছে বিখ্যাত ছাঙ্গু, গুরুডংমার ও কেচিপেরি লেক।

কথিত আছে, ত্রয়োদশ শতকে পূর্ব-তিব্বতের খ্যামের 'গুরু তাশি' একরাতে তাঁর ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য দক্ষিণে ভ্রমণের এক স্বর্গীয় নির্দেশ পান। সেই নির্দেশ অনুযায়ী গুরু তাশি তিব্বত থেকে বহু দক্ষিণে ডেমাজং (সিকিমের পশ্চিমাঞ্চলের প্রাচীন নাম) বা ধানের উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করেন। এর বর্তমান নাম চাম্বি উপত্যকা। এখানে বসতি স্থাপন করে তিনি এলাকার নাম দেন 'সু খিম্' বা সুখের ঘর। পরবর্তীকালে এই 'সু খিম্'

ব্রিটিশদের মুখে হয় সিকিম। গুরু তাশি-র আগমনের সঙ্গে তিব্বত থেকে বৌদ্ধধর্ম আসে গুরু রিনপোচের আশীর্বাদপুষ্ট সিকিমে।

বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ সিকিমের এক-তৃতীয়াংশ বনাঞ্চল। নানা ধরনের অর্কিড ও ক্যাক্টাসের জন্যও প্রসিদ্ধ সিকিম। পাখির জগতও খুব বৈচিত্র্যময়– আছে ৫৫০ রকমের পাখি ও ৬০০ ধরনের প্রজাপতি। আপার হিমালয়ে বরফ চিতা, বন্য গাধা, নীলাভ ভেড়া ও লাল পাণ্ডা দেখা যায়।

রাজ্যের জনসংখ্যা ছয় লাখ, তারমধ্যে ৬০% হিন্দু ও ৩০% বৌদ্ধ। মোট জনসংখ্যার ৭০% নেপালি, ২০% লেপচা ও ৬% ভূটিয়া।

গ্যাংটকের পথে

তারিখ ১০ মে। মধ্যাহ্নভোজের পর হোটেল থেকে বেরিয়ে কালিম্পং বাসস্ট্যান্ডে এসে সিকিমের পথে গ্যাংটকগামী বাসে উঠলাম। আড়াইটার দিকে বাস ছাড়ে। কালিম্পং থেকে গ্যাংটকের দূরত্ব ৭৫ কিমি। পথ কখনো নীচু, কখনো উঁচু ও প্রচ- খাড়া। পাহড়ের ঢালে ঘন সবুজ অরণ্য।

৩৫ কিমি পথ অতিক্রম করে আমরা রংপো পৌঁছলাম। এটি সিকিমের প্রবেশদ্বার। সিকিমে ঢুকতে বিদেশীদের বিশেষ অনুমতি নিতে হয়।

বাস পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে সিকিমে ঢুকল। কয়েক কিমি যেতেই পড়ল আরেকটি ছোট শহর, নাম সিংতাম। সিংতাম ছাড়িয়ে গাড়ি এগোতে লাগল। মাঝে মাঝে দেখছি ছোট-বড় জলের ধারা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে। পাহাড়ের গায়ে ঝাউ, বার্চ, পাইন ও দেবদারুর বন। তার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় দূরের পর্বতশ্রেণির শ্বেতশুভ্র কিরীট। বন-জঙ্গলের মাঝে ঘুমন্ত গ্রামের ছোট ছোট ঘরবাড়ি।

সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ গ্যাংটকে পৌঁছলাম। পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে ১১৫ কিমি দূরে সিকিমের রাজধানী শহর গ্যাংটক, উচ্চতা ৫,৫০০ ফুট। গ্যাংটক বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুন্দর শৈলনিবাস। বাস স্ট্যান্ডের অনতিদূরে সিকিম ট্যুরিজমের লাক্সারি হোটেল, 'হোটেল ময়ূর'-এ উঠলাম। হোটেলের ট্যারিফ একটু বেশি বলে মনটা খচখচ করছিল। কিন্তু চেক-ইন করে হোটেলের বরাদ্দ রুমে এসে, রুমের জানালা দিয়ে লাগোয়া পাহাড় আর দূরের কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ দৃশ্য দেখে সব ভুলে গেলাম।

সেভেন পয়েন্টস্ ট্যুর

পরদিন সকালে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে সাইট সিয়িং ট্যুরে গ্যাংটক ও তার আশপাশের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সাইট সিয়িং ট্যুরের নাম 'সেভেন পয়েন্টস্ ট্যুর' অর্থাৎ সাতটি দ্রষ্টব্যস্থানে নিয়ে যাবে। এখানে এই কয়টি দ্রষ্টব্যস্থানই আছে। কেউ ইচ্ছে করলে নিজের পছন্দমত 'থ্রি পয়েন্টস্' বা 'ফাইভ পয়েন্টস্' ট্যুরও বেছে নিতে পারেন।

সিকিমের অধিবাসীদের বেশিরভাগই বৌদ্ধ। তাই সিকিমজুড়ে রয়েছে অনেকগুলো বিখ্যাত বৌদ্ধমঠ। শহর থেকে বেরিয়ে ৩ কিমি উত্তর-পূর্বে পথের পাশে পড়ল খুব সুন্দর এক মনাস্ট্রি, নাম এনচে মনাস্ট্রি। ড্রাইভার মনাস্ট্রির কাছে এসে গাড়ি দাঁড় করাল। আমরা গাড়ি থেকে নেমে মনাস্ট্রিতে ঢুকলাম। তিব্বতীয় নিং-মা-পা বা হলুদ টুপি সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদের গুম্ফা এটি। চিনা প্যাগোডার অনুকরণে তৈরি। গুম্ফার প্রধান হলঘরের বেদীতে পদ্মসম্ভবের মূর্তির সঙ্গে আছে আরো নানা দেবদেবীর মূর্তি। দোতলার দেয়ালগুলো ফ্রেসকো-শোভিত। লামাদের নৃত্যের মুখোশের বিশাল সংগ্রহ দেখার মত। অদ্ভুতদর্শন মুখোশগুলো নয়নাভিরাম। কিছু কিছু মুখোশ ভয়ঙ্কর আকৃতির। আমার ছেলেমেয়ে দু'টি খুব উৎসাহ নিয়ে দেখছে। তাদের যাবার জন্য ডাকলে

বলে, না আরেকটু দেখি। কর্তৃপক্ষ এই মুখোশ বিক্রি করে কিনা জানার জন্য কাউকে খুঁজে পেলাম না। প্রদর্শনের জন্য রাখা মুখোশ নিশ্চয় বিক্রি করবে না!

গুম্ফা থেকে বেরিয়ে আমরা সামনের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকে দেখা গেল অনতিদূরে পাহাড়ের ঢালে সারনাথের অনুকরণে গড়ে তোলা মৃগ-উদ্যান। আরেকদিকে দেখা গেল মহারাজের সুদৃশ্য প্রাসাদ সুক-লা-থা।

ড্রাইভার আমাদের দ্বিতীয় দ্রষ্টব্যস্থল হিসেবে দেখাতে নিয়ে এল তাশি ভিউ পয়েন্ট। গ্যাংটকের ৮ কিমি উত্তরে অনেক উঁচু এক পাহাড়ের চূড়োর কাছে ঢালে গাড়ি দাঁড় করালে আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। আমাদের সামনে রাস্তার অপর পারে অনেক নীচ-অব্দি গভীর গিরিখাদ, তারপর অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রশস্ত পাহাড়ী উপত্যকা ক্রমশ চড়াই বেয়ে উপরে উঠে গেছে। শেষপ্রান্তে দিগন্তজুড়ে আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। সকালের সূর্যালোকে উদ্ভাসিত তুষারাচ্ছন্ন চূড়ার নৈসর্গিক দৃশ্য অনবদ্য। এখানে উলেখ্য, হিমালয় পর্বতমালার উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ এভারেস্টের অবস্থান নেপালে, দ্বিতীয় উচ্চতম (পৃথিবীর তৃতীয়) গিরিশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার অবস্থান সিকিমে। এই ভিউ পয়েন্ট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ছাড়া আরো একটি শৃঙ্গ দৃশ্যমান, নাম মাউন্ট সিনিয়ালচু। আমরা বাইনোকুলার দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলাম দূরের পর্বত আর অরণ্যানীর অনিন্দ্যসুন্দর শোভা।

এরপর ড্রাইভার আমাদের নিয়ে এল তৃতীয় দ্রষ্টব্যস্থানে– গ্যাংটকে ঢোকার তিন কিমি আগে দো-তা-বু গুম্ফা। এটি একটি অমূল্য স্মারক সম্ভারের স্তূপ– তিব্বতীয় নিং-মা-পা বা হলুদ টুপি সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদের অন্যতম পবিত্র স্থান। গুম্ফার ভিতরে আছে গুরুন্ন পদ্মসম্ভবের বিশাল সুন্দর মূর্তি। স্বল্প দূরে সোনালি চূড়োর শ্বেত-শুভ্র দো দ্রুল চোর্তেন– গ্যাংটকের বিখ্যাত বৌদ্ধস্তূপ। চোর্তেন ঘিরে আছে ১০৮টি সুদৃশ্য মনি লাখাং অর্থাৎ প্রেয়ার হুইল। ছেলেমেয়ে দু'টি খুব উৎসাহে দৌড়ে দৌড়ে মনি লাখাং ঘুরিয়ে খেলল।

এখানে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ মনে পড়ল, তাশি ভিউ পয়েন্ট দেখে ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাইনোকুলারটি গাড়ির পিছনে হুডের উপর রেখেছিলাম। গাড়িতে ওঠার সময় সেটি নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। গাড়ি চলা শুরু করলে নিশ্চয় গড়িয়ে নীচে রাস্তায় পড়ে গেছে। অনেক দামী বাইনোকুলার, আমার দীর্ঘদিনের সাথী। আমি তাড়াতাড়ি বের হয়ে ড্রাইভারকে বাইনোকুলার হারানোর কথা জানালাম। ড্রাইভারটি সদাশয়, বলল, 'আপনারা গুম্ফা দেখতে থাকুন, আমি এক দৌড়ে গাড়ি নিয়ে দেখে আসি। রাস্তায় পড়ে থাকলে পেয়েও যেতে পারি।' আমরা যতক্ষণ ওখানে ছিলাম আর কোন গাড়িঘোড়া বা লোকজন দেখিনি। ভাবলাম ভাগ্য ভাল হলে পেয়েও যেতে পারে। অধীর আগ্রহে ড্রাইভারের ফিরে আসার অপেক্ষা করলাম। কিছুক্ষণ পরে ড্রাইভার ফিরে এল মলিন মুখে। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

দো-তা-বু গুম্ফার কাছে সুন্দর সাজানো এক চত্বরে 'রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ টিবেটোলজি' অবস্থিত। বড় বড় গাছের শীতল ছায়ার ভিতর দিয়ে পথ। ত্রিতল ভবনটি তিব্বতী স্থাপত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এতে রয়েছে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম তিব্বতী গ্রন্থের সম্ভার। পুঁথিগুলোর অধিকাংশই রেশমি কাপড়ে মোড়া। সারা পৃথিবী থেকে জ্ঞানতাপসেরা এই জ্ঞানভাণ্ডারে গবেষণা করতে আসেন। আমরা ভবনে ঢুকলাম। নীচ তলা মিউজিয়ামের মত শোরুম। এখানে দেখলাম সিল্কের এমব্রয়ডারি করা থাঙ্কা, অস্থি দিয়ে তৈরি তিব্বতী বাঁশি, করোটির তৈরি পানপাত্র, মূর্তি আর নানান তিব্বতী সম্ভার। দোতলায় রয়েছে মহাযান বৌদ্ধধর্মের তিরিশ হাজার পুঁথির সংগ্রহ। তৃতীয় তলায় দেয়ালে অংকিত অজন্তা শৈলীর অতি আকর্ষণীয় ফ্রেসকো চিত্র। খুঁটিয়ে দেখতে অনেক সময় প্রয়োজন। তাছাড়া অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের নিয়ে দীর্ঘসময় ধরে এসব

দেখা সম্ভব নয়। অতৃপ্তি নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

এবার চললাম গ্যাংটক থেকে ২৪ কিমি দূরে গ্যাংটকের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ রুমটেক গুম্ফা দেখতে। গাছগাছালি, পাহাড়ি বুনো ফুল, অযত্নে ফুটে থাকা অর্কিড দেখতে দেখতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম রুমটেক।

নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক পরিবেশে এই গুম্ফাটি প্রথম নির্মিত হয় ১৭৩০ সালে। একসময় আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার ১৯৬০ সালে তিব্বত থেকে পালিয়ে আসা ক'গ্যু-পা (কালো টুপি) সম্প্রদায়ের মহামান্য ষোড়শ গিয়ালওয়া কর্মা পা বর্তমান গুম্ফাটি নির্মাণ করেন। এটি বিশ্বের অন্যতম সম্পদশালী বিহার। মাঝখানে উঠোন রেখে তিনদিকে সারি সারি ঘর, একপাশে তিনতলা মূল মনাস্ট্রি। ভবনটির স্থাপত্যশৈলী অনন্য। কাঠের কারুকাজ বিশেষ করে জানলাগুলোতে কাঠখোদাইয়ের কারুকাজ অসাধারণ। এই গুম্ফা তিব্বতের বাইরে বিশ্বের অন্যতম প্রধান বৌদ্ধ ধর্ম, সংস্কৃতি ও দর্শনের শিক্ষাকেন্দ্র।

গাড়ি থেকে নেমে গুম্ফার প্রধান তোরণ দিয়ে ঢুকে এক বিশাল বাঁধানো প্রাঙ্গণে এসে পড়লাম। উৎসবের সময় এই প্রাঙ্গণে লামাদের বিখ্যাত মুখোশ নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। প্রাঙ্গণের মাঝখানে অবস্থিত একটি স্তম্ভের গায়ে খোদিত রয়েছে তিব্বতী ভাষায় গুম্ফা তৈরির ইতিহাস। আমরা ঘুরে ঘুরে এই অনিন্দ্যসুন্দর মনাস্ট্রিটি দেখলাম। একতলায় মন্দির, দোতলায় কর্মা পা'র বাসস্থান, তিনতলায় চোর্তেন। চোর্তেনের চূড়া সোনায় মোড়া। নিচের তলায় মূল প্রার্থনা ঘর। ভেতরে রয়েছে বুদ্ধের স্বর্ণমূর্তি ও দু'টি স্বর্ণ-হরিণসহ সোনার ধর্মচক্র। রয়েছে জয়ঢাকসহ নানান বাদ্যযন্ত্র। ভিতরে প্রজ্বলিত সারি সারি অসংখ্য প্রদীপ। বাইরের বারান্দা ও ভিতরে হলের দেয়ালের প্রতিটি ইঞ্চি উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত। গুম্ফার দেয়ালে তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের নানা আখ্যানের মুর‍্যাল শোভা পাচ্ছে। গুম্ফা জুড়ে রয়েছে নানা মূর্তি, চিত্রকলা, থাঙ্কা, অজস্র বই-পুঁথি।

রুমটেক গুম্ফায় স্থাপিত হয়েছে অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাপ্রাপ্ত 'নালন্দা ইনস্টিটিউট অফ হায়ার বুড্‌ডিস্ট স্টাডিজ'। এখানে পড়ানো হয় বৌদ্ধ দর্শন, ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র এবং তিব্বতী সাহিত্য-সংস্কৃতি।

রুমটেক থেকে ফেরার পথে আমাদের পঞ্চম দ্রষ্টব্য অর্কিড গার্ডেন। বিশাল চত্বরে ঢুকতে এর শান্ত-স্নিগ্ধ রূপ মনে গাঢ় প্রশান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল। সরকারি বন দপ্তরের বাগিচা ট্রপিক্যাল গাছগাছালিতে পরিপূর্ণ। গাছগাছালির ফাঁকে পায়ে চলার ছায়াময় পথ। বাগিচার একধারে গ্লাসহাউস। সেখানে বিচিত্রদর্শন নানা আকৃতির অর্কিডের সমারোহ।

অর্কিড গার্ডেন দেখে গ্যাংটকে ফিরে মধ্যাহ্নভোজ সারলাম। তিনটের দিকে বেরিয়ে গেলাম আমাদের পরের দ্রষ্টব্য ফ্লাওয়ার শো দেখতে। বিশাল গ্লাস হাউসের মধ্যে বসন্ত ঋতুকে যেন চিরদিনের জন্য বেঁধে রাখা হয়েছে। চোখ-ধাঁধানো নানা রঙের ও রকমের ফুল আর বিচিত্র সব অর্কিডের সমারোহ সত্যি অপরূপ।

সবশেষে গেলাম ইনস্টিটিউট অফ কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ-এর হ্যান্ডিক্রাফটস্ সেলস্ এম্পোরিয়ামে। পর্যটকদের পকেট কাটার চমৎকার ব্যবস্থা। এখানে সিকিমের আকর্ষণীয় হস্তশিল্পের চোখ-ধাঁধানো নিদর্শন দেখে মুগ্ধ হলাম। বিক্রির জন্য সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে নানা ধরনের শো-পিস, কার্পেট, শিল্পমণ্ডিত টেবিল চোকৎসে, থাঙ্কা। সব কিনে নিতে ইচ্ছে হল।

ছাঙ্গু লেক

পরদিন সকালে জিপে ছাঙ্গু লেকের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। প্রয়োজনীয়

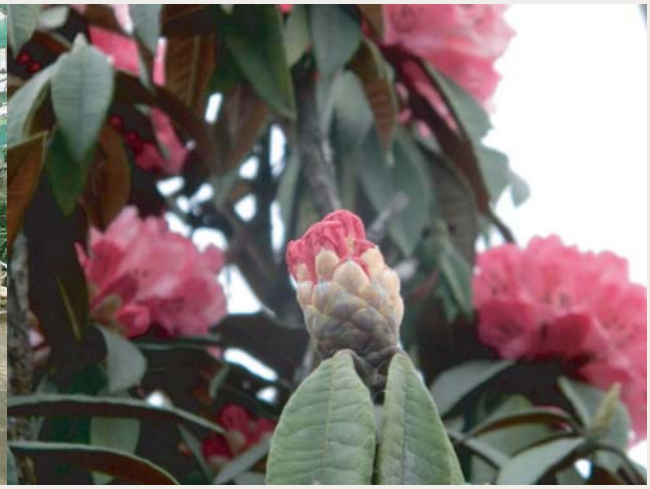

অনুমতির ব্যবস্থা ড্রাইভারই করে নিল। এখানকার ড্রাইভাররা খুবই করিৎকর্মা আর পর্যটকবান্ধব। গ্যাংটক থেকে গাড়ি ছাড়ার আধঘণ্টা পর শুরু হল উত্তর-সিকিমের খাড়া সরু রাস্তা। পাকদণ্ডী বেয়ে গাড়ি উপরের দিকে উঠতে থাকে– প্রচুর বাঁক, হেয়ারপিন বেন্ড। রাস্তার একপাশে গভীর গিরিখাদ। তবে পথের প্রাকৃতিক শোভা অনবদ্য। মাঝে মাঝে পাহাড়ের ঢালে রডোডেনড্রন, প্রিমুলা ও পপি ফুলের রমণীয় দৃশ্য। কোথাও নজরকাড়া বর্ণাঢ্য বুনো অর্কিড। আকাশের মেঘ মাঝে মাঝে রাস্তার উপর নেমে আসছে, তার সঙ্গে ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া। কিছুদূর পরপর সেনাবাহিনীর ব্যারাক। রাস্তার পাশে পাহাড়ের গায়ে কোথাও কোথাও সাদা সাদা বরফের চাপড়া। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর এক জায়গায় এসে পথের ধারে একটি ঝুপড়ির সামনে ড্রাইভার আমাদের চা পানের জন্য নামতে দিল। ঠাণ্ডার মধ্যে চা-বিস্কুট দরকার ছিল। ড্রাইভারকেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে বললাম। খুব সম্ভবত ইয়াকের দুধের চা, শীতের মধ্যে ধোঁয়া-ওঠা গরম গরম চা বেশ ভালই লাগল।

চা-পর্ব শেষ করে রওনা দিয়ে দেখলাম, মেঘের আনাগোনা আরো বেড়েছে। আশপাশে বরফের আস্তরণ আরো বেশি দেখা যাচ্ছে। একসময় আমরা ৪০ কিমি দূরে ১২,৪০০ ফুট উচ্চতায় ছাঙ্গু লেকে এসে পৌঁছলাম। প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগল।

চারদিকে উঁচু দেয়ালের মত তুষারমৌলি পর্বতের মাঝে মাইলখানেক লম্বা ও আধা মাইল চওড়া স্বচ্ছ জলের লেক। লেকের জলে টুকরো টুকরো বরফ ভাসছে। চতুর্দিকের পাহাড়ের গায়ে জমে আছে বরফ, সেই বরফের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারছে সবুজ। এই সাদা-সবুজের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে লেকের স্বচ্ছ জলে। এমন সুন্দর জায়গায় ছবি তোলা নিষেধ। কারণ, এখান থেকে মাত্র ১৪ কিমি দূরে ভারত-চিন সীমান্তের নাথু-লা পাস– খুব স্পর্শকাতর সামরিক সীমান্ত চৌকি। ১৯৬৭ সালে এখানে চিন-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পর্যটকদের যাওয়া নিষেধ। ভারতীয়রা সামরিক বাহিনী থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে নাথু-লা দর্শন করতে পারে।

লেকের পারে দাঁড়িয়ে দেখলাম কনকনে ঠাণ্ডা। হেঁটে বেড়াতে বেশ কষ্ট। তবে ইয়াকের পিঠে চড়ে বেড়াবার ব্যবস্থা আছে। গাড়ি পার্কিংয়ে কয়েকটি ইয়াক দেখেছিলাম কিন্তু সেগুলো যে পিঠে চড়ে বেড়ানোর জন্য তা বুঝিনি। গাড়ি থেকে নামার সময় ইয়াকের মালিকেরা আমাদের উদ্দেশ্যে কি যেন বলছিল, ভাষা-বিভ্রাটের কারণে বুঝিনি। ছেলেকে বললাম, ওর পিঠে চড়ে ঘুরবে নাকি? সে বলল, 'এগুলো তো ঘোড়া না, দৌড়াবে কেমন করে?' দার্জিলিংয়ে তার ঘোড়ায় চড়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার নিরিখে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না, এই লোমওয়ালা অদ্ভুতদর্শন ঘোড়ার পিঠে চড়বে কি না। মেয়ে একপায়ে খাড়া। ভাইকে বলল, 'তুই না চড়লে বসে থাক, আমি গিয়ে উঠে পড়ছি।' আমার কিছু বলার আগেই ভাইবোন দু'জন এক দৌড়ে ইয়াকের কাছে চলে গেল আর ইয়াকওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে দু'জনকে একটি ইয়াকের পিঠে তুলে দিল। কত টাকা নেবে, কতদূর নিয়ে যাবে, কতক্ষণ ঘোরাবে– এসব কিছু না জেনেই দু'জন ইয়াকের পিঠে চড়ে বসেছে। না জানি এখন কত টাকা চেয়ে বসে! সাধারণত ট্যুরিস্ট স্পটের লোকেরা খুব ধান্ধাবাজ হয়। আমি কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে যে দাম চাইল তা খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে হল। সিকিমের পাহাড়ি লোকেরা আমাদের সমতলের লোকদের মত ধূর্ত নয়। এরা এখনো অনেক সৎ। আমার উনি চড়তে রাজি হলেন না বলে আমারও চড়া হল না। ইয়াকওয়ালা ছেলেমেয়েকে নিয়ে রওনা দিল। আমরা ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে লেকের পারে হাঁটতে লাগলাম আর লেকের জলে রেনবো ট্রাউটের দর্শন মেলে কি না দেখতে লাগলাম। এই মাছের দর্শন পাওয়া নাকি খুব ভাগ্যের লক্ষণ।

কিছুক্ষণ পর ছেলেমেয়েরা ফিরে এল। দুপুর হয়েছে। খাবার নিয়ে আসিনি। এখানে যারা আসে তারা সাধারণত লাঞ্চ প্যাকেট সঙ্গে নিয়ে আসে। ড্রাইভারও আমাদের বলেছিল। পাশাপাশি এও বলেছিল, লেক এলাকার চায়ের দোকানে কোন না কোন খাবার মেলে। কোথাও বেড়াতে গেলে সব ব্যাপারে অতো আরাম-আয়াস আমার পছন্দ নয় বরং যেখানে যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকা ভাল। তাছাড়া এগুলোই হল ভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। গাড়ি পার্কিংয়ে দেখলাম দু'টি ঝুপড়ি দোকান। এসব দোকান শুধু পর্যটন মরসুমে এখানে থাকে। শীতে বরফ পড়া শুরু হলে পাততাড়ি গুটিয়ে নীচে নেমে যায়। আমরা একটা দোকানে ঢুকে ডিম-সিদ্ধ ও পাউরুটি দিয়ে ঐতিহাসিক মধ্যাহ্নভোজ সারলাম। তারপর আবারো আশপাশে খানিকটা ঘুরে চারদিকের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পান করে গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

জ্যোতিবিকাশ বড়ুয়া ভ্রমণলেখক, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা

ভ্রমণ

নীরমহল

প্রভাংশু ত্রিপুরা

'নীরমহল' ত্রিপুরাজাতির গৌরবময় স্থাপত্যশিল্পের একটি উজ্জ্বল পুরাকীর্তির নিদর্শন। এটি একটি জলপ্রাসাদ। প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বশেষ মহারাজ পঞ্চশ্রী বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর। মহারাজার উল্লেখযোগ্য স্থাপনার মধ্যে এ প্রাসাদটি অন্যতম। ক্ষিতি ও প্রজা পালনের ব্যস্ততার মাঝে গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপনের জন্য সৌখিন মহারাজ বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর এ মনোমুগ্ধকর প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন।

'নীরমহল' নির্মিত হয়েছিল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে (১৩৪০ ত্রিপুরাব্দ) রাজধানী আগরতলা থেকে ৫৩ কিলোমিটার দূরে অগ্নিকোণ বরাবর সোনামুড়া মহকুমায়। স্রোতস্বিনী গোমতী নদীতে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম সাগর সৃষ্টি করেছিলেন মহারাজ বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর। সৃষ্ট সাগরের নামকরণ করেছিলেন 'রুদ্র সাগর'। ত্রিপুরাজাতির আদি পিতার নাম সিবরাই। সিবরাইয়ের অপর নাম রুদ্র। এই রুদ্রের নামানুসারে রুদ্র সাগরের নামকরণ করা হয়। রুদ্র সাগরের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের নাম মেলাঘর। মেলাঘরের নৈসর্গিক সৌন্দর্য অপার। প্রকৃতি যেন অকৃপণ হাতে সাজিয়ে দিয়েছেন মেলাঘরকে। রুদ্র সাগরের আয়তন ৭ বর্গকিলোমিটার। সাগরের মাঝখানে ঝলমল করছে 'নীরমহল'– রূপকথার কাহিনিকেও যেন হার মানায়।

আমার নীরমহল দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মার্চ। আগরতলা বইমেলা উপলক্ষে স্পেন দেশের তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে ত্রিপুরা সফরকালে সরকারি ব্যবস্থাপনায় নীরমহল দেখা হল। নীরমহল দেখে আমার কাপ্তাই হ্রদের কথা মনে পড়েছিল। এত বিশাল কাপ্তাই হ্রদ কিনা শুধুই 'জল মহাল'!

কাপ্তাই হ্রদ সৃষ্টি হয়েছিল পার্বত্য কন্যা কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট বাস্তবায়নের ফলে। কাপ্তাই বাঁধ নির্মিত হয়েছিল ১৯৬০ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের বহুকোটি টাকা ব্যয়ে। অপরদিকে রুদ্র সাগরের বাঁধ নির্মিত হয়েছিল ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে– কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পঁয়ত্রিশ বছর আগে। তৎকালীন ব্রিটিশ আর্কিটেকচার কোম্পানি 'মার্টিন এন্ড বার্ন'কে দিয়ে ত্রিপুরার মহারাজ এই স্বপ্নপুরী 'নীরমহল' নির্মাণ করেছিলেন।

৪০০ মিটার দীর্ঘ 'নীরমহল' নির্মাণে সময় লেগেছিল প্রায় সাত বছর। নীরমহলে রয়েছে ২৪টি কক্ষ। মূল প্রাসাদ দু'ভাগে বিভক্ত। মহলের পূর্বাংশে রয়েছে মহারাজের দেহরক্ষী, পাইক্স পেয়াদা ও সৈন্য সামন্তদের আবাসস্থল আর পশ্চিমাংশে রয়েছে খাস ও অন্দর মহল। মহারাজ ও মহারানীর জন্য রয়েছে দু'টি পৃথক কক্ষ। এছাড়াও খাস মহলে রয়েছে মহারাজের দর্শনপ্রার্থী প্রজাসাধারণের জন্য দর্শনার্থী কক্ষ, নৃত্য হল, মহারাজের স্নানাগার, ক্রীড়াকক্ষ, অস্থায়ী কোষাগার এবং রাত্রি যাপনাগার। অপর দিকে অন্দর মহলে রয়েছে রাজকুমার, রাজকন্যা এবং রাজপরিবারের সদস্যদের ব্যবহারের জন্য ছ'টি মনোরম কক্ষ। এ ছাড়া প্রাসাদের অভ্যন্তরে রয়েছে মনোরম সুসজ্জিত দরবার হল এবং রাজ অতিথিদের থাকার কক্ষ।

নীরমহলের অভ্যন্তরে রয়েছে একটি সুপরিসর গালিচা। রয়েছে মহলের মাঝ বরাবর একটি সুউচ্চ টহল গম্বুজ। গম্বুজের ভেতর সর্পিল চক্রাকারে ওপরে ওঠার সিঁড়ি। এটি খুবই আকর্ষণীয় ও দর্শনীয়। গম্বুজের শিখরে টহল কক্ষ। মহারাজ যখন নীরমহলে অবস্থান করতেন তখন রাজরক্ষীরা গম্বুজের শিখরে আরোহণ করে মহল প্রহারায় নিয়োজিত থাকতেন। মহারাজ ও মহারানীর মহলে ওঠার জন্য পৃথক দু'টি পাকা সিঁড়িও রয়েছে। সিঁড়ি দু'টি জলের তলার মাটি থেকে প্রাসাদ কক্ষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে। অপরূপ কারুকার্যখচিত নৌযানে করে ত্রিপুরা মহারাজ নীরমহলে গিয়ে অবকাশ যাপন করতেন, নৌবিহার করতেন। নীরমহলের চারপাশে অথৈ জল। যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখা যায় নজরকাড়া নৈসর্গিক দৃশ্য। সৌখিন ও ঐশ্বর্যশালী নৃপতির পক্ষেই কেবল এ ধরনের মহল নির্মাণ করা সম্ভব।

বর্তমানে নীরমহলকে কেন্দ্র করে মেলাঘরে গড়ে উঠেছে পর্যটন কেন্দ্র। প্রতিদিন শত শত পর্যটকের সমাবেশ ঘটে মেলাঘরে, নীরমহলকে এক নজর দেখার জন্য। সরকারের তরফে আমাদের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল মেলাঘর পর্যটন মোটেলে। সেখানে স্থানীয় এক বৃদ্ধের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। বৃদ্ধের নাম আবদুল গনি চোপাদার, বয়স ৮২। চোপাদার শব্দটি পদবাচ্য উপাধি বিশেষ যার অর্থ সেনাকর্তা। আবদুল গণি চোপাদার ছিলেন মহারাজ বীর

বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের দেহরক্ষী বাহিনির এক সেনাকর্তা। ১৯৪৯ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন, বাড়ি সোনামুড়া সদরে। চোপাদারসাহেব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ত্রিপুরা রাইফেলস্এর একজন সেনাকর্তা হিসেবে বর্মা সীমান্তে যুদ্ধ করেন বলে জানালেন। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল অনেক অজানা তথ্য। তাঁর ভাষ্যমতে, মহারাজ বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য ছিলেন অতিশয় প্রজাবৎসল, ধার্মিক ও দূরদর্শী শাসক। প্রজাদের মাঝে অকাতরে দান্নখয়রাত কর তেন– প্রাকৃতিক অবস্থা, প্রতিকূল আবহাওয়া প্রভৃতি বিবেচনা করে তিনি প্রজাদের মাঝে বাৎসরিক কর ও খাজনা মকুব করে দিতেন। ত্রিপুরা রাজ্য বহু জাত্রি গোষ্ঠীর মিলনস্থল। মহারাজ প্রজাদের সন্তানতুল্য ভালবাসতেন, প্রজারাও তাঁকে মান্য করতেন। মহারাজ বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর ছিলেন অতিশয় সুপুরুষ, বিচক্ষণ, সাহসী ও সাত্ত্বিক। মদ্যমাংস বর্জিত নিরামিষাহারী মহারাজ ছিলেন উচ্চমানের চিত্রকর, সঙ্গীতজ্ঞ ও লোকবিজ্ঞানে বুৎপত্তিসম্পন্ন। আজকের ত্রিপুরার অধিবাসীরা তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সুফল ভোগ করছেন বলে আবদুল গনি চোপাদারের অভিমত। আবদুল গনি এখনো ত্রিপুরার সর্বশেষ স্বাধীন রাজা বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের স্মৃতি রোমন্থন করে পুলকিত হন। তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম তখনকার দিনে রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন ছিল। বৃদ্ধ জানান, রাজধানী আগরতলা থেকে মেলাঘরে আস্যাওয়ার ক্ষেত্রে তখনো রাজপথ ছিল, জিপ চলাচল করত, নৌকায় করে যাতায়াত হত, রাজকর্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা হাতি ও ঘোড়ায় করে যাতায়াত করতেন। মহারাজ অবকাশযাপনের জন্য নীরমহলে এলে মেলাঘর অঞ্চলে সাজ সাজ রব পড়ে যেত। মহারাজের সঙ্গে অনেক সৈন্যসাম ন্ত আসত। রুদ্র সাগরের চারদিকে তাঁবু গেড়ে সৈন্যরা অবস্থান করত। সৈন্যসাম ন্ত হাত্রি ঘোড়ার পদচারণায় গোটা এলাকা মুখরিত হয়ে উঠত। প্রজারা বন্য পশুপক্ষী থেকে শুরু করে নানান ধরনের ভেট ও উপহারসামগ্রী নিয়ে মহারাজের দরবারে উপস্থাপন করত। সে এক এলাহি কারবার। রাজধানীতে গিয়ে, রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে রাজার দর্শন পাওয়াটা ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। ফলে মহারাজা ও মহারানীর নীরমহলে অবস্থানকালে প্রজা ও রাজার মিলনক্ষেত্র রচিত হত। নীরমহলে বসে মহারাজ রাজ্যের প্রশাসনিক সংস্কার সাধনের পরিকল্পনা করতেন আর অবকাশযাপন শেষে রাজধানীতে গিয়ে 'রাজাদেশ' জারি করতেন। মহারাজ বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্যই ত্রিপুরা রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার উদ্যোগ নেন এবং প্রজাদের হিত সাধনে 'গ্রাম মণ্ডল' গঠন করে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যান। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা মহারাজ শাসনক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে মন্ত্রণাসভা, ব্যবস্থাপক সভা ও মন্ত্রিপরিষদ– এই তিনভাগে রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করেন। প্রশাসন পরিচালনায় দক্ষ অফিসার নিয়োগ করার জন্য 'সিভিল সার্ভিস ক্যাডার' প্রবর্তন করেন এবং শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য 'বিদ্যাপত্তন' নামে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য জরিপ কাজ শুরু করেন, রাজ্যের বেকার সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আগরতলা বিমানঘাঁটি নির্মাণেও ত্রিপুরা মহারাজ বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্যের দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এখন মহারাজ নেই কিন্তু প্রজা ও মহারাজের মিলনক্ষেত্র নীরমহল সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। নীরমহল স্বপ্নপুরী– তাকে ঘিরে আজও কত কথা হয়, তার কোন শেষ নেই।

প্রভাংশু ত্রিপুরা ভ্রমণলেখক, প্রাবন্ধিক

ভ্রমণ

প্রাণের টানে ত্রিপুরায়

মাশরুরুল বেলাল সাতবি • নুসরাত জাহান জিসা

সেই সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে কথা শুরু। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে যাবে *নকশী কাঁথার মাঠ* ও *মহুয়া* নাটক দু'টি নিয়ে। নাটক নিয়ে দেশের বাইরে যাওয়া নিঃসন্দেহে গর্ব ও রোমাঞ্চের বিষয়। বিভিন্ন জটিলতায় সে-সময় যাওয়া হল না। এরপর আবার ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে যাওয়ার নিমন্ত্রণ এল। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় সেবারও যাওয়া হল না। তৃতীয়বারে এসে ভাগ্যের শিকে ছিঁড়ল। কিন্তু ভিসা সংক্রান্ত জটিলতায় সবার মনে প্রশ্ন জাগল– এবারও কি যাওয়া হবে না? ত্রিপুরার *ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের* নিমন্ত্রণে ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতে যাবার সুযোগ এল। ভিসা সংক্রান্ত জটিলতারও সমাধান হল। এবার নাটকের মহড়া শুরু করার পালা। মহড়া শুরু হল। ১৫ দিনের কঠোর পরিশ্রমের ফসল *নকশী কাঁথার মাঠ* ও *মহুয়া*।

সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ তারিখ যাওয়ার দিন ধার্য হল। সবার মনে উত্তেজনা আর প্রতীক্ষা। অবশেষে এল সেই প্রতীক্ষিত দিনটি। ভোর চারটায় সবাই যাবার জন্য প্রস্তুত। ক্যাম্পাস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে করে কমলাপুর গেলাম। সকাল আটটায় ঢাকা-আগরতলা রুটের বাসে রওনা হলাম ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে। নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের ২২ জনের দলে আমরা উনিশজন অভিনেতা-অভিনেত্রী, দু'জন শিক্ষক আর একজন টেকনিশিয়ান। কারও প্রথমবার আবার কারও দ্বিতীয়বার ভারতে যাবার অভিজ্ঞতা, তবুও সবার মধ্যেই বিরাজ করছে উত্তেজনা। দুপুর বারোটায় পৌঁছলাম আখাউড়া সীমান্তে। সেখানে ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ করে গাড়ি প্রবেশ করল বহু প্রতীক্ষিত ভারতভূমিতে। সেখানেও নিয়মানুযায়ী কাগজপত্রের কাজ বাকি। কিন্তু প্রথমেই চমক লাগল ইমিগ্রেশন অফিস দেখে।

এয়ারপোর্টের মত সুসজ্জিত অফিসটি প্রথমেই স্বাদ দিল বিদেশে আসার। ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করে আবার বাসে উঠে পৌছলাম ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায়। টার্মিনালে বাস থামলে সবাই নেমে ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে রওনা হলাম গেস্ট হাউসের দিকে।

গেস্ট হাউসের নাম *বিমল সিংহ স্মৃতি অতিথিশালা*। সেখানে খাওয়াদাওয়া শেষে একটু জিরিয়ে নিলাম। তারপর বেরোলাম আগরতলা দেখতে। আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্থাপনা ও রাস্তাঘাট ঘুরে দেখলাম, দেখলাম ঐতিহাসিক উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ। মনে হল, শহরটি আর এর মানুষগুলো আমাদের থেকে ভিন্ন নয় বরং আমাদের মতই। একই ভাষা, একই সংস্কৃতি– সবকিছুই একই রকম। বাংলাদেশের প্রতি ত্রিপুরার মানুষের টানও মন ছুঁয়ে গেল। টান থাকবেই বা না কেন? ওদেরও তো আমাদের প্রতি একই অনুভূতি। যাই হোক, পরে সময় পাওয়া যাবে না বলে কিছু কেনাকাটাও সেরে নিলাম। ঘোরাফেরা আর কেনাকাটা শেষে আবার ফিরে এলাম গেস্ট হাউসে। পরদিন নাটকের শো আছে বিশালগড়ে তাই সেটার প্রস্তুতি নিতে হবে। ক্লান্তিকর অথচ ক্লান্তিহীন একটি দিন চলে গেল ত্রিপুরায়। আরও ৬টি দিন বাকি।

বিশালগড়ে আমরা ১১ ফেব্রুয়ারি পরিবেশন করলাম পলীকবি জসীমউদ্‌দীন রচিত এবং বিভাগের অন্যতম নির্দেশক ড. সোমা মুমতাজ নির্দেশিত নৃত্যনাট্য *নকশী কাঁথার মাঠ*। ১২ ফেব্রুয়ারি একই মঞ্চে পরিবেশিত হয় ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে দ্বিজ কানাই রচিত ও ড. সোমা মুমতাজ নির্দেশিত দ্বিতীয় নৃত্যনাট্য *মহুয়া*। দু'টি নাটকেই ছিল প্রচুর দর্শক সমাগম এবং তাদের বিপুল আগ্রহউ দ্দীপনা।

বিশালগড়বাসীর ব্যবহারে মুগ্ধ আমরা ১৩ ফেব্রুয়ারি নতুন উদ্দীপনায় রওনা হলাম ধর্মনগরে। পাঁচ ঘণ্টার রোমাঞ্চকর রেলভ্রমণ শেষে প্রায় রাত বারোটায় সেখানে পৌছলাম। এতদিনের ক্লান্তি তুচ্ছ মনে হোল যখন দেখলাম ধর্মনগরের *পঞ্চম বৈদিক* নাট্যদল এবং *স্বামী বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী মিলনায়তন* অভ্যর্থনার জন্য তৈরি হয়ে আছে। তাদের সংগঠনের দীর্ঘ বিরতি চলছিল, সেই বিরতিতে ছেদ পড়ল আমাদের নাটকের মাধ্যমে।

ধর্মনগরবাসীও আমাদের দু'টি নৃত্যনাট্যের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রদর্শন করেন। সমস্ত শহর আমাদের নাটকের ছবি সংবলিত ব্যানারে আচ্ছাদিত। আমাদের আগমন উপলক্ষে রচিত হয়েছে গান এবং মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে সেই গান পরিবেশিত হয়েছে।

নাটক শেষে ক্রেস্ট এবং উত্তরীয় প্রদানের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন আমাদের উৎসাহউ দ্দীপনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ত্রিপুরাবাসীর ডাকে আমরা শত বাধা উপেক্ষা করে আবার আসব। আনন্দ, ভালবাসা আর কিছু স্মৃতিমাখা একটি সপ্তাহ কেটে গেল যেন ঘোরের মধ্যে। আবার আসব, প্রাণের টানে আমরা আবার ত্রিপুরায় আসব।

মাশরুরুল বেলাল সাতবি
নুসরাত জাহান জিসা
শিক্ষার্থী, নাট্যকর্মী

ঘটনা পঞ্জি ❖ জুলাই

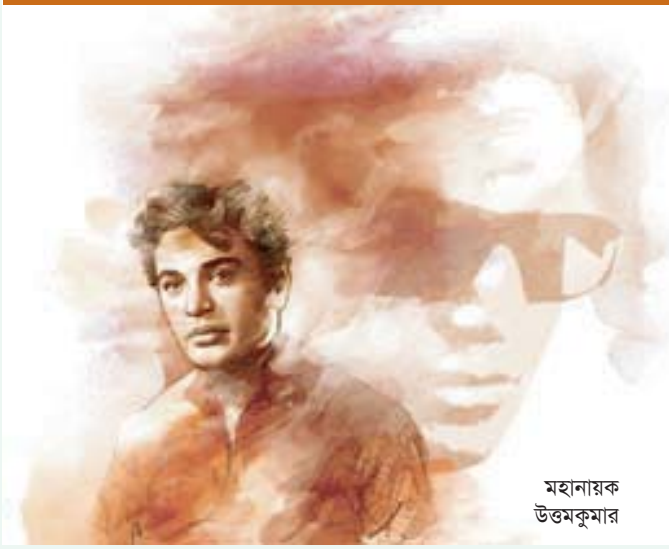

মহানায়ক
উত্তমকুমার

০১ জুলাই ১৮৮২	❖	ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম
০১ জুলাই ১৯৬২	❖	ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু
০৪ জুলাই ১৯০২	❖	স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু
০৭ জুলাই ১৯০৫	❖	প্রবোধকুমার সান্যালের জন্ম
০৮ জুলাই ১৯১৪	❖	রাজনীতিক জ্যোতি বসুর জন্ম
০৮ জুলাই ২০০৩	❖	কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু
০৯ জুলাই ১৯৩৮	❖	অভিনেতা সঞ্জীবকুমারের জন্ম
১৮ জুলাই ১৯০৯	❖	কবি বিষ্ণু দের জন্ম।
১৯ জুলাই ১৮৯৯	❖	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)এর জন্ম।
১৯ জুলাই ১৮৬৩	❖	কবিগীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম
২০ জুলাই ১৯০২	❖	কবি সুনির্মল বসুর জন্ম
২২ জুলাই ১৮১৪	❖	প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্ম
২২ জুলাই ১৯২৩	❖	গায়ক মুকেশের জন্ম
২৪ জুলাই ১৯৮০	❖	উত্তমকুমারের মৃত্যু
২৬ জুলাই ১৮৬৫	❖	রজনীকান্ত সেনের জন্ম
৩১ জুলাই ১৮৮০	❖	মুন্সী প্রেমচাঁদের জন্ম

Dove
hair therapy

Unilever

Go play with your hair.

Dove will take care of the damage.

Colour, curl, straighten; there's so much you can do with your hair but the fear of hair damage holds you back. Try Dove Intense Repair with Keratin Actives that deeply nourishes and repair your hair. So leave your hair damage worries behind. Go play with your hair and keep looking beautiful.

Ogilvy & Mather

Based on regular use of Dove Intense Repair.

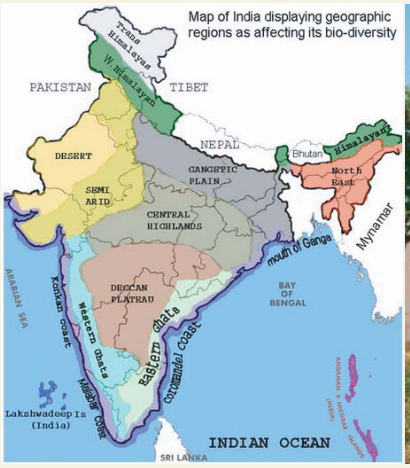

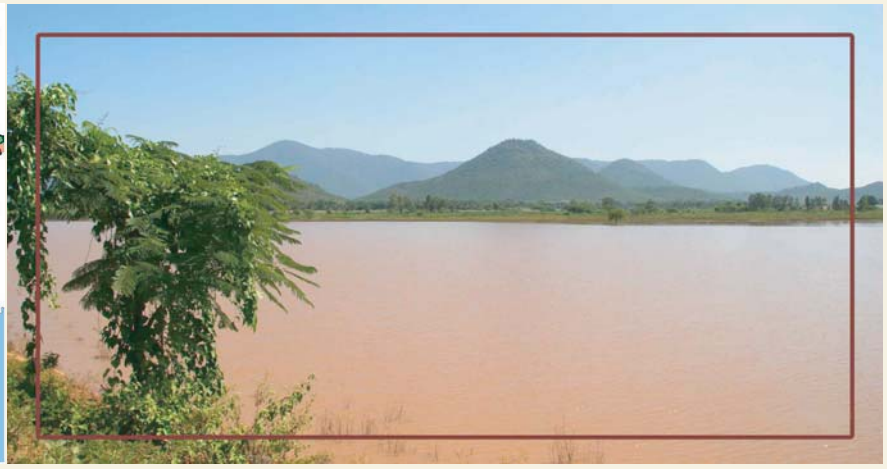

ভ্রমণ

পশ্চিমঘাট | বন্য ও বিস্ময়কর

ডি কে ভাস্কর

নগরহোল-এর গভীর বনের সর্বত্র বিপদ ওত পেতে থাকে। অসংখ্য শিকারী প্রাণী যেমন নিঃশব্দে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি পাখিদের মত আরও অনেক জীবজন্তুও দিনশেষে নিরাপদে তাদের বাসায় ফিরে আসে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জীবন-মৃত্যুর এমন অনেক ঘটনা ঘটে থাকে এখানে। দলবদ্ধ হাতি পানীয়জলের খোঁজে হেঁটে চলে মাইলের পর মাইল পথ। পশ্চিম ঘাটের জাতীয় উদ্যানগুলো ছাড়া ভারতের অন্য কোথাও এই সংরক্ষিত এশীয় প্রজাতির হাতি এত ব্যাপক সংখ্যায় দেখা যায় না।

এই বনাঞ্চল দেশীয় বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও গুল্মলতায় ভরা, এদের অনেকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। বাদবাকিরা টিকে থাকার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। এই পাহাড়ী এলাকায় বাঘ, চিতাবাঘ, শম্বর, সিংহ, লেজঝোলা টিয়াপাখি, নীলবর্ণের হনুমান, বিচিত্র বর্ণের ধনেশ পাখি, সরীসৃপ, কুমির, অবিশ্বাস্য বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি এবং বিচিত্র সব গাছগাছালির দেখা মেলে।

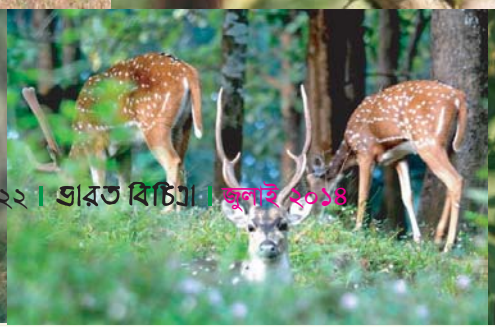

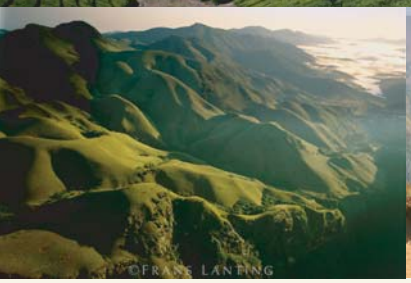

ভারতের দক্ষিণপশ্চিম উপকূল ঘেঁষে পশ্চিমঘাটের এই পর্বতমালা অবস্থিত। এই পর্বতমালার আয়তন ষোল হাজার বর্গকিলোমিটার এবং দেশের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত থেকে উত্তরে গুজরাটের অভ্যন্তরে ষোলশো কিলোমিটার পর্যন্ত প্রসারিত। বর্ষাসহ অন্যান্য ঋতুতেও পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত হওয়ায় এই পর্বতমালায় সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের এক অমূল্য ভাণ্ডার। অর্থকরী ফসলের চাষ ও কৃষি কাজের জন্য এবং কাঠের প্রয়োজনে এই বনভূমির ওপর মানুষের চাপ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, এসব বাধা সত্ত্বেও এই বনাঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদরাজি এখনও টিকে আছে।

পশ্চিমঘাট সহ্যাদ্রি পর্বতমালা নামেও পরিচিত। এই পর্বতমালা গঠিত হয়েছে ছবির মত সুন্দর মালাবার সমতলভূমি এবং ভারতের পশ্চিম উপকূল বরাবর অবস্থিত একটি পর্বতমালার সমন্বয়ে এই পর্বতমালা উপকূল থেকে অভ্যন্তরভাগে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত। ভারতের উপকূলসীমায় অবস্থিত এই শান্ত দিগন্তবিস্তৃত পথে অবসর কাটানো নিঃসন্দেহে ভ্রমণপিপাসুদের কাছে একটি মনোমুগ্ধকর স্মৃতি হয়ে থাকবে।

দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চল থেকে মরসুমি বায়ুতে বাধা প্রদান করে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত বৃষ্টিপাতের পরিমাণে তারতম্য ঘটায় পশ্চিমঘাটের এই পর্বতমালা। জুন-সেপ্টেম্বর চারমাসে সংঘটিত বৃষ্টিপাতের আশি শতাংশই পেয়ে থাকে পর্বতমালার পশ্চিম দিকে অবস্থিত এলাকাসমূহ। পূর্বদিকের এলাকাসমূহ তুলনামূলকভাবে শুষ্ক। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে কমতে থাকে। দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলীয় মরসুমি বায়ু এই পর্বতমালায় বারোটির মত নদীও সৃষ্টি করেছে। এগুলোর মধ্যে উপকূল বরাবর পূর্বদিকে প্রবাহিত তিনটি নদীই হল উলেখযোগ্য। পানীয় জল, সেচ ও জলবিদ্যুতের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হওয়ার কারণে এই নদীগুলোকে পবিত্রজ্ঞানে এ এলাকার মানুষেরা পূজা করে থাকে। এ নদীগুলোর মধ্যে দক্ষিণের গঙ্গা নামে পরিচিতি কাবেরী নদীরও উৎপত্তি হয়েছে এই পর্বতমালা থেকে। পশ্চিমঘাটে সংঘটিত বৃষ্টিপাতের পরিমাণের এই তারতম্য এবং এ এলাকার জটিল ভৌগোলিক অবস্থা একত্রে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ উদ্ভিদজগৎ সৃষ্টি করেছে, এর মধ্যে রয়েছে রৌদ্রছায়া সংবলিত নিম্নভূমি এবং সমতলভূমির গুল্মবন, পনেরশো মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট একপত্রযোগী বা পাতা ঝরে যাওয়া বনসহ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকার ক্রান্তীয় বন। বিভিন্ন ধরনের এসব বনভূমি একত্রে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ বন্যপ্রাণীর আবাসভূমি গড়ে তুলেছে পশ্চিমঘাটের এই বনাঞ্চলে।

পশ্চিমঘাটের জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও এখনও সারা বিশ্বের পঁচিশটি গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য এলাকার একটি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আবাসন সমস্যা মিটানোর প্রয়োজনে পশ্চিমঘাটের বনভূমি দখল করে আবাসভূমি গড়ে উঠছে। এর ফলে এই বনাঞ্চলের এখন মাত্র বিশ শতাংশ অবশিষ্ট রয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি উদ্বেগের বিষয়।

এক সময়ের গভীর এই বনভূমি এখন কফি, চা, রাবার এবং ইউক্যালিপটাস চাষের জন্য কৃষিভূমিতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। বনভূমির এই অপ্রতুলতা বন্য জীবজন্তু ও উদ্ভিদকূলের অস্তিত্ব ক্রমশ হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

মানুষের ধ্বংসাত্মক হস্তক্ষেপ উপেক্ষা করে পশ্চিমঘাটের জীববৈচিত্র্য এখনও টিকে আছে। নতুন এ অনাবিষ্কৃত বৃক্ষশোভিত পথ, বৈচিত্র্যপূর্ণ উদ্ভিদরাজির উপস্থিতি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এখানকার এখনও পর্যন্ত টিকে থাকা জীবনবৈচিত্র্য সবসময় বিস্ময়ের সৃষ্টি করে চলেছে।

এটি সত্যি যে আমরা আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার চেষ্টা করে যাচ্ছি কিন্তু যখনই এক্ষেত্রে ব্যর্থ হচ্ছি– সম্পদ রক্ষা করার শিক্ষাটাও আমরা দ্রুত ভুলে যাচ্ছি। এটি আমাদের জন্য সত্যিই একটি পরিহাসের বিষয়।

সূত্র **ভারত প্রসঙ্গ**
ডি কে ভাস্কর ভারতের প্রখ্যাত আলোকচিত্রী

জিজ্ঞাসা

বেলাল চৌধুরী

অবিকল গাছের মতন হলেও আদতে
গাছ নয় কাঠ নয় এমনকি সঠিক শব্দও নয়
তবে এরকম দুঃখের দৃশ্য এর আগে
কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না আমার
হঠাৎ আমার সঙ্গে সরাসরি চোখাচোখি হতে
কাঠঠোকরাটি যেন সলজ্জে বলতে গিয়ে
বিষম খেয়ে বলে উঠল, বোঝো তো
দিনকাল কি রকম পাল্টে গেছে!

কেমন নীরস আর ক্লান্তিকর
এই জীবন্নঅ ন্বেষা, মানুষের সভ্যতা
শব্দও আর শব্দ নয়, আড়ালে বলছি
কাঠ আর কাঠ নয় গাছ আর গাছ নয়

মাঝে মাঝে ভাবি আমি কি তাহলে আর আমি নই
তুমি কি কেবলি সেই তুমিতেই অনুক্ষণ,
অটল খরায়্লজ্বলা অসময়ের কৃত্রিম ফসল
আর এদিকে আমরা যেন নমনীয় প্লাস্টিসিন ডেলা হয়ে গেছি।

পাতাখসা

দীপক লাহিড়ী

জীবনের সব উত্তাপ নিভে গেলে
প্রান্ত ভাললাগা এসে পড়ে বাতাসে
নদীর খাঁড়ি দিয়ে নৌকা চলে গেল স্বচ্ছন্দ
ওখানে ঢেউয়ের কোণে ছলাছল ছিল না
দূর আলোর রেখায় তৈরি হয় প্রকৃতির সমীকরণ
বয়সের সাদা পৃষ্ঠা হলুদ হয় কালে
আমাকে আশ্রয় দাও, দিও ভাললাগা খাবাল্লদাবার
এসব বলে কৃষ্ণপক্ষের রাতে দরজা খুলে হারাল লোকটা
যে চলে যায় তার কথা বেশি দিন ভাবাও যায় না
চেনা মানুষেরা ভুলে গেল সব রকমফের
কেউ কী ছিল কোনদিন ওইখানে বারান্দার পাশে
শব্দরা উড়ে যায় কানাকানি অদৃশ্য দরজায়
সিঁড়িতে পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে মাধুরীর রাতে
তক্ষক ডাকে, ভাঙা মন্দিরের চাতালে শোনা যায়
ঝরাপাতার গান
কতক্ষণ একটানা একভাবে শুনবে কে জানে!

দীপক লাহিড়ী ভারতের কবি

ধোঁয়া

আশুতোষ ভৌমিক

সব বৃক্ষ বৃক্ষ নয়
বৃক্ষের লেবাস
পাতার ভেতরে পাতা
হিংস্র বাতাস
বিদ্‌ঘুটে আঁধাল্লপরা
গভীর রাত্তিরে
হরণ করে হরণ করে
প্রেমাংশুর শ্বাস

বৃষ্টি ছিল বলে

শামীমা চৌধুরী

আজ বৃষ্টি ছিল বলেই
রোদ্দুরের কথা মনে হল,
রোদ্দুর থাকলে, বৃষ্টি
তোমার রূপ আর
হৃদয়ের ঐশ্বর্যকে ধারণ
করতে পারি না।

বৃষ্টির ভেতরে উল্লসিত
বনরাজি–
বিষণ্ন খেত্নখামা রে
ময়ূরের পেখমমেলা উলস্নাস।

রুক্ষতা আর বিষণ্নতা
ছিল বলেই, বৃষ্টি
তোমাকে নিবিড়ভাবে পাওয়া।

ক্রমাগত বৃষ্টিতে যখন
অবগুণ্ঠিত হৃদয়
তেমনি তেমনি বৃষ্টি ভেজা
এই ক'টা দিনে
উন্মোচিত রুদ্ধ হৃদয় এ যেন
বৃষ্টির ভালবাসায়।

নির্ঘোষ ভোর

নীলিমা চৌধুরী

আমি তো জেগেই থাকি অন্তব্লেবা
গাণ্ডীবধারী অতন্দ্র পলাশ শিমুলে
কুয়াশা ছড়ানো মাঠে বেদনা পয়ার
অশান্ত আবেগে দোলে হিজল্লতমা

রবার্ট ব্রুশ গুহায় বিম্বিত সুভাষ
দেয়ালে আটকে পিঠ জেগেছে স্ব
ফাগুন আঙিনাপূর্ণ সৈরিন্ধ্রী শিশির
সংঘাত জটিল তবু উড়ান্নলিরিক

নরম শালিখ বুক সবুজ মেখলা
পাহাড়ী সিম্ফনি রোখ, তবলা সুরে
আজন্ম সংগ্রামী ক্ষণ বেহুলা বাংলা
কপালকুণ্ডলা জানে রাত্রির ওঙ্কার

রক্তিম নিবিড় তোড় শাহবাগ পথে
ধৈবতী নির্ঘোষ ভোর আমরি বঙ্গে

মুখোশের জ্বালা

এহসান হায়দার

উনুনের তাপে তার দেহ হয় নাকে
চোখে সে মাখেনি কভু বিদেশি কা
বাবার ঘাম তার সৌন্দর্য ক্রিম
মুখের আদলে তার শীতল ছাপ
নদীটির মত চপলা কথক
হঠাৎ গিয়েছে চলে–
মায়াহীন ছায়াহীন কচ্ছপের পিঠে

আলস্য

অরুণ সেন

ঘুমের জাহাজে করে এসে আহা কী যে ভালবেসে
আলস্যের স্নেহে থাকা অড়ামতার অস্ফুট ভ্রূণ
ফুঁ দিয়ে কানের মধ্যে হুশ এনে প্রশ্ন করে হেসে
বল দেখি, নিয়ত কে করে সত্যি সক্ষমতা খুন
বল কার নিস্তেজ আগুনে দগ্ধ তোমাদের তেজ
তোমাদের কে কে বল তাড়াবার চেষ্টা করে থাকে
মেদুর জড়তাভারে হারিয়েছে ব্যর্থতার বাঁকে
কে দেখায় পরম সোহাগে এই পুষ্পরূপ শেজ

এ্লকথা ব লেই সে তো বাৎসল্যের দেহে গেল মিলে
সময়্লকণিকা জ্বলে দ্রুত হয়ে নিমেষ্লসু ন্দর
বলে ওঠে, 'এই দেখ, এ্লআমার পবি ত্র অন্দর'
কুঁড়েমির কুটুমেরা সব দেখে আর ঢোক গেলে
চলার আকুতি যার পথেই লুটিয়ে খোঁজে পথ
পায়ের তলায় পন্থা চুমোতে শেখায় তার গৎ

শরীরের অধ্যয়ন

কাজল চক্রবর্তী

তোমাকে তোমার মত রেখে দেবার
আর্জি নিয়ে বেজে ওঠে মুঠোফোন
সূর্যাস্তের ঘ্রাণে উন্মত্ত পাখির মত উড়ে যায় সময়
দূর থেকে এইভাবে ভালবাসাকেও মোহ মনে হয়
দীর্ঘদিনের আবাদহীন মাটিতে বৃষ্টি এসে পড়লে
কেমন অবিশ্বাসের গন্ধে ভরে যায় চারপাশ
সমস্ত নিষ্ঠা দিয়ে শরীরের অধ্যয়ন শেষ করি
তবুও ভিজে যাবার কোন বিকল্প রাখিনি কোথাও

ফেরিওলার ছোট্ট বেহালায় বেজে ওঠে পরিচিত কোন গান
ঠিক ওভাবে বাজাতে পারব না জেনেও হাত বাড়াই
এ কি অধিকারে, না ভালবাসায়, না কি মোহে!
এইটুকু জেনে নিতেই পুরুষজীবন ধারণ করে আছি–

কাজল চক্রবর্তী ভারতের কবি

পিঁপড়েকামড়

শাহজাদী আঞ্জুমান আরা

সবকিছু ফেলে তুমি কোথায় যে যাও!
পিঁপড়েকামড় প ড়ে পায়ের পাতায়!

প্রতীক্ষার বেণী খুলে সময় পোহায়
রোদ। ইচ্ছের গুহার মুখ বন্ধ করে
নেবুলাস ছায়া নামে জীবনের রঙে
ধূসর অবসাদের পিঠে কষ্টক্লান্তি
এলোমেলো শুয়ে থাকে। আর তুমি দেখ
কী এক অন্যরকম রুক্ষ বন্যতায়
পিঁপড়েকামড় তাড়া কর ছে আমাকে।

স্থিতিটুকু আছে গ্রামদেশে

সুজন হাজারী

এই স্থিতিটুকু ল্যান্ডমার্ক আজো আছে গ্রামদেশে
একটু খেত জম্মিজি রেত ফলবতী গাছ
গোছা গোছা দুধেভরা নধর ধানশীষের
বিনুনি গেঁথে গৃহস্থরা শ্রদ্ধাভরে ঝুলিয়ে রাখে
গোলার কোণে অথবা জ্যেষ্ঠ ঘরের দরজার উপরে।

ধানসাধে নবান্নের উৎসব
স্থিতিটুকু আজও আছে প্রতি ঘরে ঘরে
দুধপোষা ধান নারীর গর্ভজাত সন্তান চাল
যা খেয়ে মানুষ বাঁচে–
জীবনের প্রতীক চাল আর মানুষ সমান।

ঘরদোর লেপ্লেমু ছে স্নান সমাপন
চাল গুঁড়ার আলপনা আঁকে রমণীরা
পুজো ও পিণ্ড আয়োজনে
কাঁচাদুগ্ধকল্যাচাল এক ত্রে মেখে
প্রসাদ ছেটায় ঘরের চালে
ত্রিকালজ্ঞ ভূশণ্ডি কাকেরা আহার খেয়ে ফেলে
পরলোকগত পিতৃপুরুষের প্রশান্তি মেলে।

পুরোহিত মাথায় ছুঁয়ে চিমটিতে তুলে
বিতরণ করে সবার করতলে
মাজারের সিন্নি লোভে শিশুদের ভোঁদৌড়।

ভ্রমণ

কাজিরাঙ্গা

কল অফ দ্য ওয়াইল্ড

নাসরীন মুস্তফা

ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীর জুড়ে শুয়ে থাকা ৮৬০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যানের বয়স এখন একশো দশ বছর। কাজিরাঙ্গা ব্রহ্মপুত্র নদীর বুকে ভাসছে নূহ নবীর নৌকার মত। এর উপরে আশ্রয় নিয়েছে পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যেতে থাকা অসহায় পশু-পাখিরা। কাজিরাঙ্গা যদি ঠাঁই না দিত, তবে এরা হারিয়ে যেত কালের গর্ভে, যেমন হারিয়ে গেছে ডায়নোসরের মত কত কত প্রজাতি। একালে যে হারে গাছপালা কেটে জঙ্গল সাবাড় করার ধূম পড়েছে, সেখানে নিজের জঙ্গুলে চরিত্রটি বহাল রেখে একশো বছর পার করা বড় ব্যাপার বৈকি!

স্থানীয় কারবি উপজাতীয়দের ভাষায় কাজিরাঙ্গা শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে, যেখান থেকে পাহাড়ী ছাগল পানি খুঁজে পায়। কাজিরাঙ্গার নামকরণ নিয়ে একটি উপকথা চালু আছে। কাজি নামের এক তরুণ প্রেমে পড়েছিল রাঙ্গা নামের এক তরুণীর। দু'জনে যে গ্রামে বাস করত, তার সীমান্তে ছিল এক গহীন জঙ্গল। কাজি আর রাঙ্গা একদিন জঙ্গলে প্রেম করতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। সেই থেকে জঙ্গলটার নাম হয়ে যায় কাজিরাঙ্গা।

১৯০৫ সাল পর্যন্ত এটা ছিল স্থানীয় উপজাতি ও শিকারীদের তীর্থস্থান। কাজিরাঙ্গার ভাগ্য সুপ্রসন্ন করে দিয়েছিলেন ইংরেজ ভাইসরয় লর্ড কার্জন– যদিও এর জন্য প্রথম ধন্যবাদটি পাবেন লেডি কার্জন। ভারতবর্ষে স্বামীর চাকরির সুবাদে থাকতে আসা লেডি কার্জন উত্তর-পূর্ব ভারতে একশিঙে গণ্ডার দেখতে পাওয়া যায় বলে শুনেছিলেন। উৎসাহী লেডি কার্জন কাজিরাঙ্গায় বেড়াতে এসে মন খারাপ করে ফেললেন প্রায় বিলুপ্ত হতে থাকা একশিঙে গণ্ডারদের জন্য। তখন কাজিরাঙ্গাতে মাত্র ১০/১২টি একশিঙে গণ্ডার ছিল। রাজা-মহারাজেরা তো বটেই, ব্রিটিশ আমলারাও ইচ্ছে হলেই গণ্ডার শিকারে বেরিয়ে পড়তেন। কুচবিহারের মহারাজ নাকি নিজের হাতে ৩০০টি একশিঙে গণ্ডার মেরেছিলেন!

তবে কাজিরাঙ্গার গল্পটি কিন্তু লর্ড আর লেডি কার্জনের থেকে শুরু হয়নি। এর জনক আরেক ব্রিটিশ, নাম ফর্বস। বিশ শতকের প্রথম শতকে যখন ইংরেজদের হাত ধরে অসম জুড়ে চাবাগান বি স্তার লাভ করছে, তখনকার গল্প এটি। অন্য আরো অনেক চাবাগা নের মত নাহারজন ছিল তেমনি এক চাবাগান। এখনকার কাজিরা ঙ্গা যেখানে অবস্থিত, তার ঠিক পাশেই ছিল নাহারজনের ঠিকানা। আর আদ্যোপান্ত নিপাট ভদ্রলোক ফর্বস ছিলেন নাহারজন চাবাগানসহ গোটা এলাকার বাংলোর সামনে। লেডি কার্জন সঙ্গীসাথী নি য়ে চারদিক ঘুরে দেখতে বেরুবেন। ফর্বস নিগোনা শিকারী নামে দুর্ধর্ষ এক অসমীয় মাহুতকে গাইড হিসেবে দিলেন, যাতে জঙ্গলে মহামান্য অতিথি কোন সমস্যায় না পড়েন। নামে শিকারী হলেও নিগোনা কখনও পশু শিকার করেননি। বরং তিনি ছিলেন এই এলাকার জঙ্গুলে রাস্তা আর চারপাশের গাছপালা সম্বন্ধে স্বভাবজাত জ্ঞানের আধার। লেডি কার্জনের নানান প্রশ্নের জবাব দিতে নিগোনা পিছপা হবেন না, এই ছিল ফর্বসএর ধারণা। নি গোনা

হাতির পিঠে চড়ার সময়সূচি

দিনে তিনবার চড়া যায়
সকাল ৫৩০ থেকে ৬৩০
সকাল ৬৩০ থেকে সকাল ৭৩০ এবং
সকাল ৭৩০ থেকে সকাল ৮৩০ পর্য ন্ত

সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দর

জোড়হাট -১০০ কিমি
গোয়াহাটি -২১০ কিমি
তেজপুর (সালোনিবাড়ি) -৭৫ কিমি
সবচেয়ে কাছের রেলস্টেশন -২০০ কিমি
ঐতিহাসিক শহর তেজপুর -৬৫ কিমি

কাজিরাঙ্গা সম্বন্ধে সাধারণ তথ্যাবলী

অবস্থান: উত্তরপূর্ব ভারতে অবস্থিত অসম রাজ্যের মাঝখানে
অক্ষাংশ: ২৬'৩০ উত্তর থেকে ২৬'৪৫ উত্তর
দ্রাঘিমাংশ : ৯৩'০৮ পূর্ব থেকে ৯৩'৩৬ পূর্ব
আয়তন : ৪৩০ বর্গ মিলোমিটার
জলবায়ু : প্রায় গ্রীষ্মম-লীয় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বছরে গড়ে ১৩২০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয় এবং শীতকালে তাপমাত্র ৮' সেলমিয়াস ও গ্রীষ্মে ৩৮' সেলমিয়াস বিরাজ করে।
বনভূমির পরিমাণ : ২৯.১৩%
ঘেসো জমির পরিমাণ : ৫১.৯২%
লেকের পরিমাণ : ৬.৬২%
জলাভূমির পরিমাণ : ৫.২১%
বালুময় ভূমির পরিমাণ : ৭.২১%

(তখন এর নাম ছিল– দোয়াং) মহামান্য ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি নাকি লর্ড ও লেডি কার্জনের সঙ্গে দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

১৯০৫ সালের জানুয়ারি মাস। লর্ড কার্জনের ভাইসরয় হিসেবে শাসন করার শেষ বছর। লেডি কার্জন অসমে এসেছেন বেড়াতে। ফর্বস তাঁকে ঐ এলাকার বিরল ফুললতাপাতার গ ল্প শুনিয়ে উৎসাহিত করলেন। লেডি কার্জন তখন নাহারজন চা বাগানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। যাত্রার দিনে ফর্বসের আদেশে তিনটি হাতি এসে দাঁড়াল শিকারী নিলেন লেডি কার্জন যে হাতির পিঠে চড়েছিলেন, তার দায়িত্ব। পাশের হাতিটার পিঠে ফর্বস। নিগোনা ইংরেজি জানেন না, কাজেই তিনি যা বলবেন, তা ইংরেজিতে লেডি কার্জনকে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্বটা ফর্বসই পালন কর ছেন।

জঙ্গলের বেশ অনেকখানি ভেতরে যাওয়ার পর নিগোনা হাত তুলে একটি একশিঙে গণ্ডার দেখালেন লেডি কার্জনকে। লেডি কার্জন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে এটা একটা গণ্ডার। তিনি একে বুনো মোষ মনে

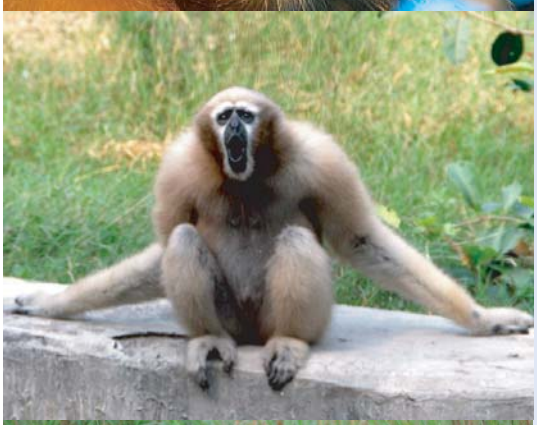

করে বার বার বলছিলেন, এটা কিভাবে গণ্ডার হয়?

দ্বিধায় পড়ে গেলেন ফর্বস। নিগোনার জ্ঞানের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। ওদিকে লেডি কার্জনের কথাও ঠেলে ফেলতে পারছেন না। তিনি নিগোনাকে প্রাণীটির আরো কাছে যেতে আদেশ দিলেন। না খেতে পেয়ে এ্যাত্তো শুকিয়ে গেছে বেচারা যে, ওটাকে মোষ বলেই ভ্রম হয়। গণ্ডারটাও বুঝি লজ্জা পেয়েছিল। কোনমতে দুর্বল শরীর নিয়ে জঙ্গলের পথে হারিয়ে গিয়ে নিজের মানস ম্মান রক্ষা করল। কাদার উপর পড়ে রইল ওর চার পায়ের প্রতিটিতে তিনটি করে আঙুল, যা প্রমাণ করে দিল ও আসলেই একটা গণ্ডার। পায়ের ছাপ দেখে লেডি কার্জনও স্বীকার করে নিলেন ওর পরিচয়। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন একশিঙে গণ্ডারদের সম্বন্ধে। সুযোগ বুঝে প্রকৃতিপ্রেমিক ফর্বসও বললেন, কিভাবে শিকারীদের হাতে নির্বিচারে মারা পড়ছে অসহায় প্রাণীগুলো।

করুণ স্বরে লেডি কার্জন জানতে চাইলেন, হাউ ক্যান উই সেভ দিস ওয়ান্ডারফুল এনিম্যাল? সরল জবাব নিগোনা শিকারীর, সাহেবসু বোদের বলে দেন, তারা যেন এদের না মারে।

লেডি কার্জন কলকাতায় ফিরে গিয়ে এই অসহায় প্রাণীদের টিকিয়ে রাখার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করলেন। তাঁর এই অনুরোধের প্রেক্ষিতে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন কাজিরাঙ্গাকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করলেন। ১৮৯৮ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ভাইসরয় হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে লর্ড কার্জন ভারতের মাটিতে হিন্দু-মুসলিম বিবাদের বীজ বপন করেছিলেন বলে ইতিহাস তাঁকে কখনও ক্ষমা করবে না। অন্যদিকে এই তিনিই একশিঙে গণ্ডারদের বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করলেন, এর জন্য অনেকখানি ধন্যবাদও কিন্তু তাঁর প্রাপ্য।

১৯০৫ সালের ১ জুন ব্রিটিশ সরকার সব ধরনের শুটিং বন্ধ করে কাজিরাঙ্গাকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার এক নোটিশ জারি করে। বন্যপ্রাণীদের নির্বিচার হত্যার উৎসব বন্ধ করতে এটি ছিল প্রথম পদক্ষেপ। ১৯০৮ সালে কাজিরাঙ্গায় প্রাণীশিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই বছরই কাজিরাঙ্গা সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর ১৯৪০ সালে এটি বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য এবং ১৯৭৪এ জাতীয় উদ্যান বা ন্যাশনাল পার্ক হিসেবে সম্মানিত হয়। এই সম্মান কাজিরাঙ্গা কর্তৃপক্ষকে অনেক বেশি উৎসাহিত করে নিঃসন্দেহে। এর প্রমাণ মেলে দু'বছরের মাথায়। ১৯৭৬ সালে কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক শ্রেষ্ঠ সুপরিচালিত জাতীয় উদ্যান হিসেবে ইন্ডিয়ান বোর্ড অফ ওয়াইল্ড লাইফের 'চেয়ারম্যানস ট্রফি' লাভ করে। কাজিরাঙ্গার কারণেই একশিঙে গণ্ডার এখন দারুণ জনপ্রিয় এক 'লোগো' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। রাজ্যের অনেক কোম্পানি ও কর্পোরেশনের অফিসিয়াল লোগো হচ্ছে একশিঙে গণ্ডার। অসম স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বাসগুলোর গায়ে গণ্ডারের মুখ উঁকি দিচ্ছে। কাজিরাঙ্গার অদূরবর্তী তেজপুর শহরস্থ ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের ফাইটার স্কোয়াড্রনএর ক্রেস্টেও গণ্ডারের মুখ।

কাজিরাঙ্গার সীমানার বেশির ভাগ অংশ মরা ডিফলু নদীর শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়েছে। ওদিকে জাতীয় সড়ক নম্বর ৩৭ বঞ্চিত প্রেমিকের মত কাজিরাঙ্গার জন্য ভালবাসা বুকে চেপে ছুটে চলেছে পার্কটির পাশাপাশি। পার্কের দক্ষিণ অংশে চুপচাপ ধ্যানে বসেছে মিকির পাহাড়, জমিন থেকে যার মাথার উচ্চতা হাজার মিটারেরও উপরে। লম্বা লম্বা ঘাস আর নদীর পানির পুষ্টি নিয়ে বেড়ে ওঠা জঙ্গল কাজিরাঙ্গার শরীরের ভূষণ। মাটি আঁকড়ে থাকা ঘাস আর আকাশ ছুঁতে চাওয়া গাছের শেকড় টের পেয়ে যায় কাজিরাঙ্গার অসংখ্য জলাভূমি, পরস্পর যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া স্রোতস্বিনী আর বিল নামে পরিচিত ষাঁড়ের শিংএর মত বাঁকা হ্রদগুলোর গোপন কথামালা।

কাজিরাঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য সবচেয়ে খ্যাতি পেয়েছে পৃথিবী থেকে বিলুপ্তপ্রায় দুর্লভ একশিংওয়ালা রাইনোসেরাস বা গণ্ডারের জন্য। মূলত এই একশিঙে গণ্ডারদের রক্ষা করার জন্যই লর্ড কার্জন কাজিরাঙ্গাকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। বন্য প্রাণীদের এই ঘোরতর দুর্দিনেও কাজিরাঙ্গার জমিন দাবড়ে বেড়ায় প্রায় ১৬০০ গণ্ডার। এত গণ্ডার পৃথিবীর আর কোনও জঙ্গলে নেই। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সারা পৃথিবীর সব বনাঞ্চলে সব মিলিয়ে যত

একশিঙে গণ্ডার আছে, তার শতকরা ৬৫ ভাগ গণ্ডারের আদি নিবাস এই কাজিরাঙ্গা!

একশিঙে গণ্ডার ছাড়াও কাজিরাঙ্গায় অদম্য গতিতে ছুটে চলা বুনো মোষ, জলাভূমির সৌন্দর্যের সঙ্গে মানানসই জলাহরিণ, হাতি, বাঘ, হায়েনা, গউর, শম্বর, বন্যশুকর, নীলগাই, বাইসন, চিতাবাঘ, ভালুক, চারশিঙে এন্টেলোপ, কুমির, লেঙ্গুর আর বন্ধুসুলভ গাঙ্গেয় ডলফিনের জনপ্রিয়তাও কম নয়। কাজিরাঙ্গায় আছে ৫৯৯র মত বুনো হাতি, ১০০এর মত বু নো মোষ, ১২০০ হগ ডিয়ার, ৩২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ২৬ প্রজাতির সরীসৃপ, ২৯৯ প্রজাতির পতঙ্গ আর ৫০০রও বেশি প্রজাতির পাখি!

তবে সবকিছুর উপর রাইনোসেরাস, মানে একশিঙে গণ্ডার কাজিরাঙ্গা নামক রাজ্যের রাজা। দর্শনার্থীরা খুব কাছ থেকে দেখেন রাজাদের, তাতে এনারা কিছু মনে করেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত বিরক্ত না হচ্ছেন, ততক্ষণ তথাস্তু।

হাতির পিঠে চড়ে কিংবা ফোর হুইল মোটর গাড়ি দাবড়িয়ে বনে ঘুরে বেড়ানোর সময় বুকের গভীরে জিম করবেটের আত্মাটাকে জেগে উঠতে দেখে শিহরন জাগে শরীরে। যারা একটু উদাসী প্রকৃতির এবং বেশি নড়াচড়া পছন্দ করেন না, তাঁদের জন্য সোহোলা, মিহিমুখ, কাঠপোড়া, ফোলিয়ামেয়ার এবং হারমোতিতে অনেকগুলো ওয়াচটাওয়ার আ ছে। মাটির অনেক উপর থেকে বাতাসের সঙ্গে ফিসফাস আর বুনো জঙ্গলের সৌন্দর্যসম্পদ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা– এই অনুভূতি পাওয়া যায় কেবল কাজিরাঙ্গাতেই। আকাশে উড়ছে পাখি– হাজারে হাজারে, ঝাঁকে ঝাঁকে। কাজিরাঙ্গার পাখিসা ম্রাজ্যও অন্য যে কোন পার্কের তুলনায় সমৃদ্ধ। ঈগল পাখির বিরল সব প্রজাতি এখানকার আকাশে দিব্যি উড়ে বেড়াচ্ছে। ওদিকে জমিনে চলছে পাহাড়ী পাইথন আর অদ্ভুতড়ে সরীসৃপদের বুক ঘেঁষটে চলাচল। এতসব দেখতে দেখতে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই... আরেব্বাহ! শীতের সময় এখানকার বিখ্যাত অসমীয় চায়ের স্বাদ গ্রহণ করা আর হাটখুলি, মেথোনি, ডিফলু, বেহোরা বোর্চাপুরির মত কাজিরাঙ্গার ধারেকাছের চা বাগানগুলোর সৌন্দর্য উপভোগ করা যে উপরি পাওয়া! কাজিরাঙ্গার সীমানার বাইরে কাকোচাঙ ঝর্না। প্রাচীন নুমালিগড়ের ধ্বংসস্তূপের ভেতরকার অপূর্ব সুন্দর ঝর্নাও ভিজিয়ে দেবে মন।

শীতে কাজিরাঙ্গায় আসার নিমন্ত্রণ দেওয়াটাই যথার্থ। কারণ, প্রকৃতি কাজিরাঙ্গার রূপের ঘোমটা পুরোপুরি খুলে দেয় নভেম্বর থেকে এপ্রিল, এই ছয় মাস। কাজিরাঙ্গায় আসাটাও তেমন কঠিন নয়। মঙ্গলবার, বুধবার ও শনিবার কলকাতা থেকে পেনে তেজপুর হয়ে মোট ৯৭ কিমি দূরে জোড়হাট বিমানবন্দর। সোমবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও রবিবার পেন কলকাতা থেকে জোড়হাট আসে গৌহাটি ছুঁয়ে। গৌহাটি বিমানবন্দর থেকে এরপর গাড়িতে করে ২১৭ কিমি পার হয়ে সোজা কাজিরাঙ্গা। পার্কের সবচেয়ে কাছের রেলস্টেশনটি ৪৩ কিমি দূরে, নাম ঝাখলাবান্ধা, চাকারমুখশিলঘাট শাখা লাইনে। কাজিরাঙ্গার একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলপথে গৌহাটি থেকে জোড়হাট যাওয়ার ট্রেনটির নতুন নাম হয়েছে কাজিরাঙ্গা এক্সপ্রেস। এই ট্রেনে কাজিরাঙ্গা ফরেস্ট লজের জন্য সব সময়ই দশটি রিজার্ভ সিট থাকে।

কাজিরাঙ্গা গৌহাটি থেকে ২১৯ কিমি, জোড়হাট থেকে ৯৬ কিমি, ফারকোটিং ৭২ কিমি, নওগাঁ ৯৬ কিমি, জোড়হাট হয়ে ডিব্রুগড় ২২২ কিমি, শিলং ২৮৬ কিমি এবং কলকাতা থেকে ১৪২৭ কিমি (শিলিগুড়ি, গৌহাটি হয়ে)। অসম রোড ট্রান্সপোর্টের বাস চলছে হরদম। জোড়হাট, ফারকোটিং থেকে বাস আসছে কাজিরাঙ্গার মাত্র ৫ কিমি দূরের কোহোরাতে।

গৌহাটি থেকে গাড়ি চালিয়ে এখানে আসাটা এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। মহাসড়কের সমান্তরালে শুয়ে থাকা বিশাল ধানখেত জঙ্গুলে পাহাড়গুলোর চারপাশে সবুজের উৎসব লাগিয়ে দিয়েছে। দূরে দেখা যাচ্ছে গ্রামগুলো, চিরায়ত ভারতীয় গ্রাম, বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে ছোট ছোট পুকুরগুলো স্নিগ্ধ করে দিচ্ছে মন। ইচ্ছে করলে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকা ধাবার সামনে গাড়ি থামিয়ে চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে আরো বেশি চাঙ্গা হওয়া যায়। মনে হয়, কাজিরাঙ্গা দর্শনে অভ্যর্থনা যা জুটছে, তা এক কথায় অতুলনীয়। কাজিরাঙ্গার

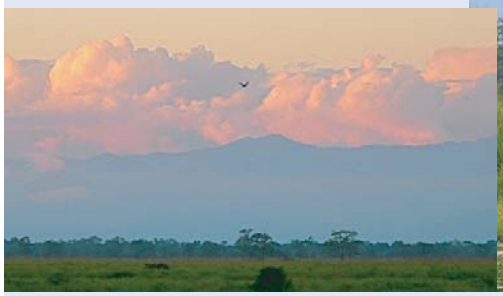

প্রবেশপথও সুন্দর। প্রশস্ত রাস্তা, ধানখেত আর জঙ্গলের সঙ্গে চা-বাগানগুলো মিলেমিশে আছে রাস্তার দু'পাশে। দিগন্তে তাকালে ব্রহ্মপুত্রকে নাচতে দেখা যায় ঢেউ খেলিয়ে। কোহোরা পার হয়ে ত্রিশ মিনিটের পথ পার হলে কাজিরাঙ্গার পর্যটক বেজ। কয়েক কিমি পরে একটি গ্রাম, সেটা পার হলে পর্যটকদের জন্য বুনো ঘাসের রাজত্বে তৈরি করা ঔপনিবেশিক কেতার এক চমৎকার হোটেল। চুপচাপ নীরবতার মাঝে টাটকা হাওয়া, দম টানলে নিমেষেই ফুরফুরে হয়ে যায় ফুসফুস। এখান থেকেই পরের দিনে হাতির পিঠে চড়া এবং জিপ সাফারির সব ব্যবস্থা করে নেওয়া যায়। রাত নামলে কাঠের বারান্দায় রকিং চেয়ারে বসে দোল খাওয়া, চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ঝিঁঝি পোকার শব্দ শোনা আর আগামীকালের রোমাঞ্চকর অভিযাত্রার পরিকল্পনা করতে করতেই ঘুম নেমে আসবে দু'চোখ জুড়ে।

নভেম্বরের প্রথম দিনেই পা ফেলুন কাজিরাঙ্গার সবুজ মাটিতে। কোহোরাতে নেমেই ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস থেকে সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টার ভেতর প্রবেশ টিকিট কিনে নিন। ওটা ছাড়া যে কাজিরাঙ্গার প্রবেশ দ্বার আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবে না। অরণ্য নিবাস কিংবা বনানী লজ কিংবা বনশ্রী লজে কিংবা সুবিধাজনক এরকম কোথাও জায়গা করে নিন রাতে ঘুমানোর। আগেভাগে বাংলো রিজার্ভ করে নিলে তোফা!

থাকাখাওয়া চি ন্তা মিটিয়ে চমৎকার একটি ঘুমে রাত কাবার করে পরের দিন, অর্থাৎ ২ নভেম্বরই না হয় চোখ মেলে দিন কাজিরাঙ্গার দিগন্তে। কাজিরাঙ্গায় কিন্তু শীতের সময় তীব্র শীত আর গরমের সময় প্রচণ্ড গরম পড়ে। কাজেই, বনে বেরুনোর আগে ঠিকঠাক প্রস্তুতি নিতেই হবে।

পর্যটন বিভাগে আগেভাগে বলে রাখলে ভোর পাঁচটায় আপনার জন্য জিপ অপেক্ষা করবে সন্দেহ নেই। জিপে করে চলে আসুন ৪ কিমি দূরের মিহিমুখ হাতি পয়েন্টে। পার্কে পৌঁছে যাওয়ার পর কষ্টের আর কিছু নেই। মহাপ্রাণ হাতিরা পিঠ নিচু করে দেবে মহামান্য রাজাকে তুলে নেওয়ার জন্য। টুক করে উঠে পড়লেই হল, এরপর শান্তশিষ্ট এবং ভদ্র হাতির পিঠে চড়ে ঘুরে ঘুরে জঙ্গল দেখা ছাড়া আর কাজ নেই।

কাজিরাঙ্গায় বেড়াতে আসা অতিথিদের জন্য ২৩টি হাতি আছে মিহিমুখ হাতি পয়েন্টে। সকাল ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গলে ঘোরা যায়। একটি হাতিতে ৩ থেকে ৪ জন বসতে পারে। হাতির পালা শেষ হলে, অর্থাৎ সকাল ৬টা থেকে ৮টার পর জিপ, হাড়ি অথবা মিনিবাসে চড়ে জঙ্গলে ঢোকা যায়। এরপর মিহিমুখ, বাগুরি, হোলেপথ, আরিমাড়া ইত্যাদি এলাকা দিয়ে ভোঁ ভোঁ করে ধুলো উড়িয়ে সত্যিকারের বন্য পশুদের সঙ্গে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে পারবেন ইচ্ছেমত। কাজিরাঙ্গার গহীন জঙ্গলের ভেতরে অনেক লেক আছে। প্রতিটি লেক জানা অজানা নানান পাখি, বিশেষ করে মাছরাঙ্গা, ফ্লেমিঙ্গো আর বকদের সমাগমে মুখর। এশিয়ার সবচেয়ে লম্বা পাখিদের অন্যতম সারসদের দেখা যাবে সপরিবারে মাছ ধরতে ব্যস্ত অবস্থায়। পাখির রাজ্যে এসে আকাশে উড়ে যাওয়ার জন্য কেন ডানা নেই, এই দুঃখে দুঃখিত না হয়ে উপায় নেই।

অসমের জাতীয় মহাসড়ক ধরে অরক্ষিত জিপ গাড়িতে করে যাওয়া প্রায় অসম্ভব মনে হলে এখানে সেটা সম্ভব জঙ্গল রুদ্রমূর্তি ধারণ করে বসে নেই গিলে খাওয়ার জন্য। বরং এই বন্য সৌন্দর্য ঢুলু ঢুলু চোখে যখন চেয়ে দেখে বেড়াতে আসা শহুরে মানুষদের, তখন তাদের চোখেও ঝিম লাগে। যে জীবন জলাহরিণের, একশিঙে গণ্ডারের, সেই মাদকতাময় জীবনের জন্য হাহাকার আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে মানুষ মনটাকে। দীর্ঘশ্বাসগুলো উড়ে যায় বকপক্ষীর ডানা ছুঁয়ে, যখন অন্য রকম পিলসুজ জ্বালিয়ে সন্ধ্যা নামে কাজিরাঙ্গার কোল জুড়ে। হায়, কী সুখেই আছে এই মাটিতে জন্ম নেওয়া ঘাস, বুনো ফুলেরা!

কাজিরাঙ্গার সবই সুন্দর। চারদিকের সবুজ, আকাশের নীল, লেকের পানিতে ঘূর্ণিপাক– সবকিছু খুব সুন্দর। এত সৌন্দর্যের মাঝে সমস্যাও কিছু জমেছে এতদিনে। অসমের বন্যপ্রাণী অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলেছেন, কাজিরাঙ্গার মাটিতে সৃষ্ট ক্ষয়জনিত সমস্যার ফলে ঘাসের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এতে বিলুপ্তপ্রায় যেসব প্রাণী ঘাস খেতে পছন্দ করে, যেমন একশিঙে গণ্ডার, খাদ্য সমস্যায় পড়ে গেছে। মাটিতে ঘাস জন্মাচ্ছে কম, অথচ তরতর করে মাটি দখল করে ছড়িয়ে পড়ছে প্রাণীদের পরিপাকতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর মিষ্টিগন্ধের হলুদ ফুলবিশিষ্ট কুজকন্টক। একশো বছর আগে লেডি কার্জন বারোটা একশিঙে গলণ্ডার দেখে মন খারাপ করেছিলেন, এখন এখানে গণ্ডার আছে ১,৬০০এরও বেশি। কাজিরাঙ্গার শুভাকাঙ্ক্ষীরা বলছেন, গণ্ডারদের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে, এটিও একটি সমস্যা। খাদ্যের পরিমাণে টানাটানি পড়ছে বলেই গণ্ডারদের নির্দিষ্ট একটি সংখ্যায় বেঁধে ফেলে বাকিগুলোর কোন 'ব্যবস্থা' করা প্রয়োজন। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ ড. জন বি সেলএর মতে, 'গণ্ডারদের সংখাধিক্য কমানোর জন্য অন্তত পক্ষে কিছু গণ্ডারকে কিছু সময়ের জন্য কাজিরাঙ্গা থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া দরকার। অসমে এরকম বহু চমৎকার জায়গা রয়েছে।'

একদা পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়ার শঙ্কা নিয়ে দিন কাটানো

একশিঙে গণ্ডার এখন টিকে যাওয়ার চমৎকার একটি সমস্যায় পড়েছে বৈকি!

কাজিরাঙ্গার দক্ষিণ অংশে ৪০ কিমি লম্বা অংশ জুড়ে বয়ে যাওয়া বন্যার পানি আরেকটি বড় সমস্যা তৈরি করেছে। প্রতি বছর ব্রহ্মপুত্র নদীতে বন্যা হলে কাজিরাঙ্গার ভেতরে পানি চলে আসে, পার্কের সবক'টা রাস্তা পানির নিচে চলে যায় আর পানি সরে গেলে বেরিয়ে আসে ধ্বংস নিয়ে। পানির তোড়ে বিভিন্ন রেঞ্জে অবস্থিত শত শত ক্যাম্প ভেসে যায়। পুরো পার্কটাকেই নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে, তাই পানি সরে গেলে ঠিকঠাক করতে প্রয়োজন পড়ে অতিরিক্ত বাজেটের। সাম্প্রতিককালে স্থায়ী ক্যাম্প তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে কংক্রিটের স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণের জন্য সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে কয়েকটি এনজিও।

কাজিরাঙ্গার ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া জাতীয় মহাসড়কের উপর দিয়ে প্রতিদিন ভারি গাড়ি চলাচল করে। অসম সরকার এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গুজরাটের পোরবন্দর থেকে দক্ষিণঅস মের শিলচর পর্যন্ত জাতীয় মহাসড়কটিকে ছয়টি লেনএ ভাগ করার চি ন্তাভাবনা করছে। পশুদের জন্য করিডোর, কিছু প্রাকৃতিক ফ্লাইওভার কিংবা অনন্ডারগ্রাউন্ড টানেল তৈরি কিংবা পুরো মহাসড়কটিকে আরো দক্ষিণে সরিয়ে দেওয়া যায় কি না, তার চিন্তাভাবনা চল ছে।

পার্কের তৃণভুক প্রাণীদের জন্য অবশ্য বন্যা আশীর্বাদ। এতে জমি উর্বর হয়, ভাল ঘাস জন্মায়। আর দেখা গেছে, প্রতি বছর বন্যা রুদ্ররূপ ধারণ করে না বরং প্রতি ৮ থেকে ১০ বছর পর পর ক্ষতিটা বেশি হয়। বন্যায় প্রাণীরা মারা পড়লেও একে প্রাকৃতিক ভারসাম্য হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। জলাহরিণ এবং অন্যান্য তৃণভুক প্রাণীর সংখ্যা যে হারে বাড়ছে, তাতে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে এমনিতেই না খেয়ে মারা পড়বে। তখন মাংসাশী প্রাণীগুলো উপায় না দেখে মনুষ্যবসতিতে হামলা চালাবে বেশি করে। এখনই মানুষেপ্র শুতে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। একশিঙে গণ্ডারদের জন্য কাজিরাঙ্গার আলোচনা বেশি হওয়াতে এতে বেড়ে ওঠা ব্যাঘ্রকুলের জন্মসংখ্যাস্ফীতির ঘটনা প্রায় আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। ২০০০ সালের শুমারি অনুযায়ী সুন্দরবন ছাড়া দেশের অন্যান্য জায়গার ভেতর সবচেয়ে বেশি বাঘ আছে এখানেই। অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীর সংখ্যাও বাড়ছে। তাই বন্যার ফলে মারা যাওয়া পশুদের মৃত্যুকে ট্রাজিক বলা যাবে না। এ বরং প্রকৃতির নিজস্ব উপায়ে সমস্যা সমাধানের এক কৌশল।

মানুষপ শুর দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গে মানুষহাতির দ্বন্দ্বের কথাই সবার আগে মনে পড়ে। মানুষ এবং হাতি উভয়ের জন্যই বসবাসের স্থান ক্রমশ কমে আসছে, খাবারের ঘাটতি পড়ছে। কাজিরাঙ্গার জমিনে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানো হাতিরা আজ এদিক তো কাল ওদিক, এভাবে চিরায়ত রুট ধরে স্বভাববশত ঘুরে বেড়াতে চায়। দিনবদলের সঙ্গে সঙ্গে কাজিরাঙ্গায় মানুষের সংখ্যা বেড়েছে অনেক। মানুষ বসতি গড়ছে, গ্রামের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। হাতিদের চলার পথ যদি গ্রাম হয়ে যায়, তবে হাতি তো মানুষের মুখোমুখি হবেই।

অনেক কথাই তো হল। শীতে আসুন কাজিরাঙ্গায়, উপভোগ করুন অসমের অপরিমেয় বন্যতা আর আতিথেয়তা।

নাসরীন মুস্তফা কথাসাহিত্যিক

কাজিরাঙ্গার মানচিত্র

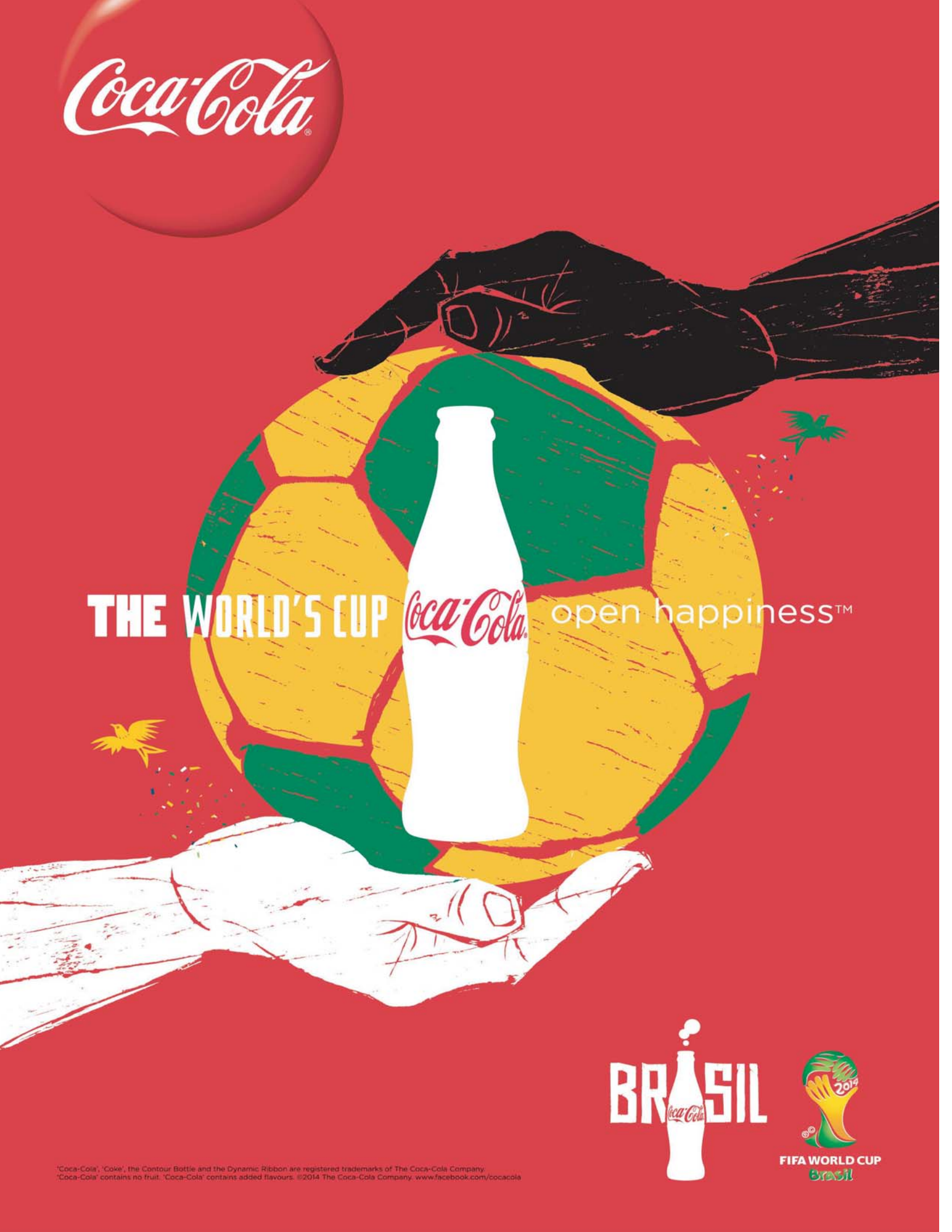

'Coca-Cola', 'Coke', the Contour Bottle and the Dynamic Ribbon are registered trademarks of The Coca-Cola Company.
'Coca-Cola' contains no fruit. 'Coca-Cola' contains added flavours. ©2014 The Coca-Cola Company. www.facebook.com/cocacola

ধারাবাহিক উপন্যাস

নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময়

সেলিনা হোসেন

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

আজ বকুল বিদেশ যাবে।

সকাল থেকে বাড়িতে ধুমধাম আয়োজন। আত্মীয়-স্বজন এসে বাড়ি জমজমাট করেছে। চারদিক থেকে হই-চই হাসাহাসির শব্দ আসছে। রান্নাঘরে হাঁফিয়ে উঠেছে শিউলি। একদিকে কাজের চাপ, অন্যদিকে মন খারাপ। দুটো বিষয় একসঙ্গে নিতে পারছে না ও। হঠাৎ করে কান্নাও পাচ্ছে। মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে। মা থাকলে ওকে এতসব হ্যাপা সইতে হত না। কেমন করে যে দিন গড়িয়ে গেল। এখন মায়ের একটি মেয়ে দূরে যাচ্ছে। আয়-রোজগার করবে। বাড়িতে দালান তুলবে। হায় রে স্বপ্ন! মায়েরও তো কত স্বপ্ন ছিল। তার ধারেও যেতে পারেনি মা। উল্টো ছিটকে পড়েছে হাজার হাজার মাইল দূরে।

ওর দিকে তাকিয়ে বড় ফুপু বলে, তুই একটু বাইরে যা মা। বাইরে গিয়ে বাতাসে দাঁড়া। একটু ঠাণ্ডা হয়ে আয়। আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে শিউলি। উঠোনে এসে দাঁড়ালে দেখতে পায় বকুলের সঙ্গে ব্যাগ গোছাচ্ছে অনেকে। খালাতো, চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো ভাইবোনেরাও ঘিরে ধরে বসে আছে ওদের। বেশ উৎসব উৎসব ভাব। বাইরের ফুরফুরে বাতাসে স্বস্তি ফিরে আসে শিউলির। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ায়। বাবাকে খোঁজে। চারদিকে তাকিয়ে খেয়াল করে। যদি কোথাও বসে থাকে তাহলে কাছে গিয়ে হাত ধরে বলবে, বাবা বাড়ি চলো। একটি মেয়ে বাড়িতে নেই তো কি হয়েছে? আরও চারজন রয়েছে। সবাইতো তোমার যত্ন করে বাবা।

কিন্তু না, পথে-মাঠে-গাছতলায় কোথাও জয়নুল মিয়া নাই। কোথায় গেল বাবা। শিউলির দুশ্চিন্তা হয়। ও বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শুনতে পায় পদ্মর কণ্ঠস্বর। ও বলছে, তোমাকে আমরা কাঁচা হলুদ বাটা মাখিয়ে গোসল করিয়ে দেব বুবু।

বকুল বিরক্তির সঙ্গে বলে, কেন?

ধরো আজ তোমার গায়ে হলুদের দিন।

গায়ে হলুদ?

বিদেশে তোমার যদি কারো সঙ্গে বিয়ে হয় তাহলে কে তোমার গায়ে হলুদের উৎসব করবে? তখন মন খারাপ করবে। ভাববে, বিয়েটাতো হল, কিন্তু গায়ে হলুদের দিন পেলাম না।

তোরা কি চুপ করবি? যতসব আজগুবি কল্পনা।

পদ্ম জোর দিয়ে বলে, মোটেই আজগুবি না। এটাই সত্যি।

বকুল রেগে গিয়ে বলে, তোর কাছে সত্যি। আমার কাছে না।

যাবার দিনে মেজাজ গরম কোরো না।

আমার যা খুশি তাই করব। তোরা আমার মেজাজ খারাপ করে দিস না।

হাস্নুহেনা হাহা ক রে হেসে বলে, আমি তোমার পায়ে আলতা লাগিয়ে দেব।

আলতা? বকুলের মেজাজ আবার খারাপ হয়। আলতা লাগাবি কেন?

তাহলে আমাদের কথা তোমার অনেকদিন মনে থাকবে।

আলতা ছাড়াও মনে থাকবে। আলতা আর কয়দিন পায়ে থাকবে? দুই দিন?

চম্পা বলে, আমি তোমার নখে নখপালিশ লাগিয়ে দেব। আমি লাল রঙের নখপালিশ কিনেছি।

তোর নখে লাগা।

তাহলে তোমার চুলে বেণী গেঁথে দেব।

বকুল কথা বলে না। সবকিছুতেই ওর বিরক্তি লাগছে। কেন, তা ও বুঝে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। চারদিকে তাকিয়ে বলে, শিউলি বুবু কৈ? বুবু আমার জন্য কিছু করবে না?

বেড়ার পাশ থেকে মুখ বাড়িয়ে শিউলি বলে, হ্যাঁ, আমিতো একটা কিছু করবই। তবে সবাইকে নিয়ে করব।

বাড়ির আঙিনায় ঢুকে ও বলে, এইজন্য আমি বাজানকে খুঁজছিলাম। ও সবার কাছে এসে বলে, বকুল যখন শেষ ভাত খাবে তখন আমরা চার বোন ওর মুখে চার লোকমা ভাত তুলে দেব। প্রথম লোকমা দেবে বাজান। বাজান যে কোথায় গেল কে জানে। তবে বাজান যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ আমরা ভাত খাব না।

ঠিক বলেছে বুবু।

এতক্ষণে বকুল উৎফুল-হয়ে কথা বলে।

ওদের এই আনন্দসম য়ের মাঝে জয়নুল মিয়ার মাথায় ঘূর্ণি। মেয়েটা এভাবে একা একা যাবে। পথেঘা টে বিপদের তো শেষ নাই। সউদিতে যেখানে থাকবে সেখানেও বিপদ নেই তাই বা কে বলবে! জয়নুল মিয়া প্রবল উৎকণ্ঠায় রাস্তার ধারে পায়চারী করে। সোহেলের সঙ্গে জরুরি কথা বলবে। সোহেলকে ডেকে আনার জন্য ওর বাড়িতে লোক পাঠানো হয়েছে। ছেলেটা যদি বিয়েতে রাজি হয়– আলাহ মেহেরবানে, জয়নুল হাত উপরে তোলে। দোয়া পড়ে। অস্থির সময় যে কত কঠিন সেটা অনুভব করে জয়নুল মিয়ার মনে হয় পুরো শরীর শিথিল হয়ে যাচ্ছে। হাতপা ছেড়ে দেওয়া যাকে বলে। বেশ অনেকক্ষণ পরে দেখতে পায় সোহেল আসছে।

কাছে এসে সোহেল বিস্মিত হয়ে বলে, চাচাজান, আমাকে কেন ডেকেছেন। কি হয়েছে? বকুল যাবে না?

বকুলতো যাবেই। তোমার কাছে আমার একটা আবেদন আছে বাবা।

বসেন চাচা। এই গাছতলাতেই আমরা বসি।

এই কাশেম তুই চলে যা। আমরা একটু বসি।

আপনি পান খাবেন চাচা?

না, না কিছু লাগবে না। বলছিলাম কি–

জয়নুল মিয়া একটুক্ষণ থামে। বুক ধুকধুক করে। কথাটা বলা কতটা উচিত হবে। এই কথা শুনলে বকুল কি রাগ করবে?

চাচা বলেন, কি বলবেন আমাকে। আজকে আমরা যাবতো, বাড়িতে অনেক কাজ।

ও হ্যাঁ, বলছিলাম কি–

জয়নুল মিয়া আবার থামে। তারপর কেশে নিয়ে বলে, বলছিলাম কি বাবা, মেয়েটাকে একা একা পাঠাতে ভরসা পাচ্ছি না। তোমাদের বিয়েটা হয়ে গেলে ভাল হত না?

বিয়ে? বিয়ের ঝামেলা নিয়ে বিদেশ যাব?

ঝামেলা? ঝামেলা বলছ কেন? বকুলের সঙ্গে তোমার বিয়ে তো হবেই।

সেটা ভবিষ্যতে হবে। এখন বকুল বকুলের মত বিদেশে যাবে। আমি আমার মত। বিয়ে হলেই বকুল আমার বউ হবে। ওর কিছু হলেই ওর ঝামেলা আমার ঘাড়ে তুলতে হবে। আমি এসবের মধ্যে নাই। ঝাড়া হাতপা থাক তে চাই।

ও কোন বিপদে পড়লে তুমি দেখবে না?

দেখব। নাও দেখতে পারি। কিন্তু বউ হলে তো দেখতেই হবে। তখন না দেখে উপায় থাকবে না।

তুমি এসব কি বলছ বাবা?

আমি ঠিকই বলছি চাচা। আমার সাফ সাফ কথা। আমি বোঝা কাঁধে নিয়ে বিদেশ যাব না।

তুমিতো ওকে ভালবাস। সেই রকমইতো আমি শুনেছি।

ঠিকই শুনেছেন।

তাহলে?

চাচা আপনি আমাকে জোর করবেন?

কাজী ডেকে ঘরোয়াভাবে বিয়ে পড়ানো মাত্র।

আমরা ঘুরে আসি তারপরে হবে।

যাও যাও। যা খুশি তা করো। সরে যাও আমার সামনে থেকে।

সোহেল মুহূর্তে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। যেন ও বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়েছে এমন একটা ভাব। স্মালাইকুম চাচা, বলে ও হনহনিয়ে হেঁটে চলে যায়। পেছন ফিরে তাকায়ও না।

জয়নুলের মাথায় রক্ত চড়ে যায়। জোরে জোরেই বলে, জানোয়ার। পরক্ষণে নিজেকে সামলায়। গাছের কাণ্ডে শরীর হেলিয়ে দিয়ে পা সামনে সোজা করে রাখে। দু'হাত মাটির ওপর চেপে রেখে নিজেকে সামলায়। চোখ বন্ধ হয়ে যায়। সন্ধ্যার বাসে সোহেলের সঙ্গে বকুল ঢাকায় যাবে। কাল সকালে ওদের পেন। জয়নুল মিয়া বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে মেয়েকে বিদায় দেবে। ঢাকায় যেতে পারবে না।

অনেকক্ষণ গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে থাকে জয়নুল মিয়া। ঘাড়ে লাল পিঁপড়া কামড় দিলে নিজের রাগ চড়চড়িয়ে বাড়ে। হাতের তালুতে পিঁপড়ে পিষে মারলে দেখতে পায় সারিবদ্ধ পিঁপড়ে নামছে। কোথায় যাবে ওরা? নিজেকেই প্রশ্ন করে, জয়নুল মিয়া তোমার এতকিছু জেনে দরকার কি? যে প্রশ্ন তোমার সামনে, তার উত্তরতো তোমার কাছে নেই। চুপচাপ বাড়ি যাও। দেখ ওরা কি করছে? দেখ গিয়ে তোমার বাড়িতে উৎসব না শোক? জয়নুল মিয়া উঠে দাঁড়ায়। দেখতে পায় পিঁপড়ার সারি সামনে এগোচ্ছে। ওদের সারি ভেঙে যাচ্ছে না। ছোটকাল থেকে কত হাজারবার পিঁপড়ের সারি দেখেছে কিন্তু আজকে যেভাবে দেখছে এভাবে দেখা হয়নি। এর আগে নিজের মেয়েকে নিয়ে গভীর ভাবনায় পিঁপড়ে সারি ওর চারদিক বেষ্টন করেনি। কোন শৃঙ্খলও ওর সামনে ছিল না। আজ এই প্রথম নিজেকে এক গভীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ দেখতে পায়। জয়নুল মিয়া দু'হাতে চোখ মুছে বাড়ির পথে রওনা করে। বাড়ির দরজার ঝাঁপ সরানোর সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পায় সম্মিলিত কণ্ঠস্বর, বাজান এসেছে, বাজান বাজান।

সবার আগে শিউলির প্রশ্ন, বাজান আপনি কোথায় ছিলেন?

গাছতলায়।
গাছতলায় কি করেছেন?
বসেছিলাম।
পিঁপড়ে কামড়ায়নি?
কামড়িয়েছে।
কোথায় দেখি?
এই দেখ, ঘাড়ের এখানে।
বসেন বসেন। বারান্দায় বসেন। আমরা দেখি।

জয়নুল মিয়া বারান্দায় বসে ফতুয়া খোলে। চারদিকে ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরে তাকে। ফুলে লাল হয়ে ওঠা জয়গাটা দেখে সবাই একসঙ্গে আহারে শব্দ করে। ছোট গল্পু বলে, মামা আপনার সঙ্গে কি ছোট পিঁপড়ের ফাইট হয়েছিল?

না, ফাইট হয়নি। আমি ওটাকে পিষে মেরেছি।
হাজার হাজার পিঁপড়ে আপনার গায়ে ভরে গেলে কি করতেন?
পিষে মারতাম।
পারতেন না। ওরা আপনাকে কামড়ে ডোল বানিয়ে ফেলত।
আমার কি শক্তি নাই?
আপনি তো একা। ওরা হাজার হাজার।
তাইতো! জয়নুল ভুরু কুঁচকায়।

চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেমেয়েরা হাসিতে ভেঙে পড়ে বলতে থাকে, মানুষ আর পিঁপড়ের ফাইট। কে হারে কে জেতে! কে হারে কে জেতে!

শিউলি চামচে তেল গরম করে নিয়ে এসে বাবার ঘাড়ে গলায় লাগিয়ে দেয়। একটু আরাম বোধ করে ও। বকুল এসে পাশে বসে। বলে বাজান, আপনি আমার জন্য একটুও ভাববেন না বাজান।

তুমিতো একা একা যাচ্ছ মা।
তাতে কি, আমি ঠিকই পারব।
কেমন করে পারবে? পিঁপড়াতো হাজার হাজার।
পিঁপড়ে? পিঁপড়ের কথা বলছেন কেন?
ওরাতো পিঁপড়াই। সুযোগ পেলে কামড়ায়।

মেয়েরা আকস্মিকভাবে চুপ হয়ে যায়। বুঝতে পারে ওদের বাবা কোথাও থেকে একটি ধারণা নিয়ে বাড়িতে ফিরেছে। সে ধারণা তার জন্য আনন্দদায়ক হয়নি। শিউলি ভাবে, সোহেলের সঙ্গে হয়তো কথা বলেছে বাবা। নিশ্চয় বিয়ের কথা বলেছে। সোহেল রাজি হয়নি। এমন ধারণা শিউলির মধ্যে গেড়ে বসে।

বকুলও এই ভাবনা ভাবে। বাবা নিশ্চয় সোহেলের সঙ্গে কথা বলেছে এবং সেখানে বসে পিঁপড়ের সারি দেখেছে।

হাস্নুহেনাও এই একই ভাবনা ভাবে। বাবা বোধহয় সোহেলের সঙ্গে কথা বলে খুশি হয়নি। নিজের মেয়েকে যার সঙ্গে যেতে দিচ্ছে তার সঙ্গে কথা বলে খুশি না হলে নিজেকে পিঁপড়ের সঙ্গে হেরে যেতে দেখতে পায়। তখন একটা পিঁপড়ে হাজার পিঁপড়ে হয়ে ওঠে।

চম্পাও এই একই ভাবনা ভাবে। বাবা বোধহয় সোহেলের সঙ্গে কথা বলে ওকে রাজি করাতে পারেনি। সেজন্য বলেছে, ওরাতো, পিঁপড়েই। মানুষকে পিঁপড়ে বলছে বাবা। যে পিঁপড়া কামড়ালে ওই জায়গাটি ফুলে ওঠে। লাল হয় এবং জ্বালা করে। বাবা সোহেল নামের পিঁপড়ের কাছ থেকে কামড় খেয়ে বাড়িতে এসে যন্ত্রণায় তড়পাচ্ছে।

পদ্মও একই ভাবনা ভাবে। বাবা বোধহয় যে মতলবে সোহেলকে কাছে ডেকেছিল সে মতবল হাসিল হয়নি। বাবা একটি গাছের নিচে বসেছিল। সে গাছে হাজার হাজার পিঁপড়ে ছিল। বাবার হাতেপা য়ে শুকনো পাতার কুচি লেগে আছে। চুলের সঙ্গে গাছের ছালের শুকনো টুকরো লেগে আছে। আজ বাবা একটি পিঁপড়ে হয়ে গেছে। তার পাঁচটি মেয়ে আছে। একটি ছেলে পাওয়ার সাধ ছিল তার। একটি ছেলে থাকলে সেও একটি ঢাউস পিঁপড়ে হত। বাবা তখনও বুঝতে পারত পিঁপড়ে কামড়ালে কি হয়!

শিউলি বাবার ঘাড়ে তেল লাগানো শেষ করে বলে, বাজান গোসল করবেন চলেন। গাছের নিচে বসে ছিলেন তো আপনার হাতেপা য়ে কুটোকাটা লেগে আছে।

বকুল বাবার অন্য হাত ধরে বলে, আজ বাজানের গায়ে আমি পানি ঢেলে দেব। বাজানের গায়ের ময়লা ধুয়ে দেব। চলেন বাজান।

জয়নুল মিয়া দুই মেয়ের হাত ধরে কলের ধারে আসে। ছোটরা পিছে পিছে যেতে চাইলে পদ্ম বাধা দিয়ে বলে, কেউ যাবি না। সবাই এখানে থাক।

এখানে থেকে কি করব?
তাহলে আমরা বাইরে যাই।
চম্পা বলে, বাইরে গিয়ে তোরা কি করবি?
বুলবুলির ধান খাওয়া দেখব।
দেখতে পাবি না।
কেন?
ধানের মাথা জাল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে।
হায়, হায় পাখির সঙ্গে এমন শত্রুতা!

শত্রুতা না করলে বুলবুলি ধান খেয়ে ফেলবে। তখন আমরা কি খাব?

বল্টু হিহি ক রে হাসতে হাসতে বলে, ধানের খোসা।
তবে রে, দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা।

চম্পা ওদেরকে তেড়ে ওঠার আগেই ছেলেমেয়েরা এক দৌড়ে বাড়ির বাইরে চলে যায়। ওদের হাসিতে কলমুখর হয়ে থাকে প্রাঙ্গণ।

চম্পা বলে, এখন আমার একটা ছড়ার কথা মনে হচ্ছে। আগে এমন মিলিয়ে দেখিনি।

কি ছড়া?

ছেলে ঘুমালো/ পাড়া জুড়ালো/ বর্গী এল দেশে/ বুলবুলিতে ধান খেয়েছে/ খাজনা দেব কিসে–

পদ্মর প্রশ্ন, খাজনা কি বুবু?

জানি না। ছড়াটা মা খুব বলতেন। আমাদের ঘুমোনোর আগে। মনে নেই তোদের?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে।

চম্পা একটুক্ষণ দাঁত কামড়ে ধরে রাখে। পরে বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, মা এখন কি করছে কে জানে–

পদ্ম তড়বড়িয়ে ওঠে, কি আর করবে, গুনগুন করে কাঁদছে–

কাঁদবেই তো। মায়ের একটি মেয়ে যে বিদেশে চলে যাচ্ছে!

মায়ের মেয়েটা কি বুলবুলি যে ধান খেতে যাচ্ছে?

না, মায়ের মেয়েটা পরের খেতের ধান খাবে না। উপার্জন করতে যাচ্ছে। নিজের গায়ের খাটনির উপার্জন। উপার্জন দিয়ে মায়ের জন্য দালান বানাবে।

হাস্নুহেনা বলে, এবার আমার পালা।

তোমার আবার কিসের পালা?

বাড়ি ছাড়ার পালা। আমি ঢাকা শহরে গার্মেন্টসে কাজ করতে যাব।

কোথায় থাকবি?

পারমল আপার সঙ্গে। ওরা ছয়সাত জন মি লে এক জায়গায় থাকে সেখানে।

কখন এত ব্যবস্থা হল? কার সঙ্গে কথা বললি?

বাজান শুনলে কষ্ট পাবে। এসব কথা এখন বলার দরকার নাই। বকুল বুবুর যাওয়ার দিন দশেক পরে আমি মায়ের কাছে যাব। আগে মাকে বলব। মা কি বলে শুনে বাজানকে জানাব।

সেই ভাল।

ধপ করে পড়ে যায় পদ্মর রাগ। ও নিজেও ওদের সঙ্গে হাসতে থাকে। বারান্দায় বসে থাকা তিন বোন দেখতে পায় জয়নুল মিয়ার সঙ্গে ওদের বড় দুই বোন হেঁটে আসছে। তিনজন মানুষকে একসঙ্গে অন্যরকম দেখাচ্ছে। বাবা একটা ধোয়া লুঙ্গি পরেছে। গায়ে গেঞ্জি। চুলগুলো এলোমেলো। কোন কোন চুলের আগা থেকে পানি ঝরছে। আজকে ওদের বাবাকে খুব কাহিল দেখাচ্ছে। যেন উঠোনটুকু পার হওয়া তার পক্ষে খুব কষ্টের। যেন উঠোনটা সউদি আরবের বিশাল মরুভূমি।

পদ্ম ধাপ করে মাটির ওপর পা দাপায়। ধমাধম কয়েক বার পা দাপিয়ে বলে, আমার জন্ম না হলে মায়ের এ অবস্থা হত না।

চম্পা হি হি করে হেসে বলে, মা তোর উল্টো বলে।

কি, কি বলে?

তুইও জানিস কি বলে।

ও বুঝেছি। বাবামা য়ের তালাক না হলে মা দশটা মেয়ের জন্ম দিত। সমাজকে এক হাত দেখিয়ে দিত।

ধপ করে পড়ে যায় পদ্মর রাগ। ও নিজেও ওদের সঙ্গে হাসতে থাকে। বারান্দায় বসে থাকা তিন বোন দেখতে পায় জয়নুল মিয়ার সঙ্গে ওদের বড় দুই বোন হেঁটে আসছে। তিনজন মানুষকে একসঙ্গে অন্যরকম দেখাচ্ছে। বাবা একটা ধোয়া লুঙ্গি পরেছে। গায়ে গেঞ্জি। চুলগুলো এলোমেলো। কোন কোন চুলের আগা থেকে পানি ঝরছে। আজকে ওদের বাবাকে খুব কাহিল দেখাচ্ছে। যেন উঠোনটুকু পার হওয়া তার পক্ষে খুব কষ্টের। যেন উঠোনটা সউদি আরবের বিশাল মরুভূমি।

হাস্নুহেনা ফিসফিস করে বলে, মনে হচ্ছে বাবা একটা মরুভূমির মধ্য দিয়ে হাঁটছে। গরম বালুতে বাবার পা পুড়ে যাচ্ছে। পোড়া পা নিয়ে বাবা এই বারান্দার বসে থেকে ভাববে, হায়রে দুনিয়া, কিসেরও লাগিয়া–

অন্যরা হাস্নুহেনার কথায় সাড়া দেয় না। বারান্দায় পেতে রাখা মাদুরটা টানটান করে বিছিয়ে ঝেড়ে দেয়। নিজেরা অন্যপাশে চলে যায়।

বাজান বসেন।

জয়নুল মিয়ার পায়ের স্পঞ্জের স্যান্ডেল খুলে দিয়ে দুইবোন বাবাকে বারান্দায় বসিয়ে দেয়। চম্পা চিরুনি এনে বলে, বাবার চুল আমি আঁচড়ে দেব। এই বয়সেও বাবার মাথাভর্তি চুল।

বাবা যে ভাগ্যবান মানুষ। সেজন্য বাবার মাথা থেকে চুল ঝরে না।

কিভাবে বাবা ভাগ্যবান?

কেন যার ঘরে পাঁচ মেয়ে তার ভাগ্য সবচেয়ে ভাল।

তোমরা কি আমাকে নিয়ে তামাশা করছ মায়েরা? এতক্ষণে জয়নুল মিয়া মুখ খোলে।

ছি ছি বাজান, আমরা কি আপনার সঙ্গে তামাশা করতে পারি! বকুল চলে যাচ্ছে এজন্য আপনার মন ভাল রাখতে চাই। এটাতো সত্যি যে আপনার পাঁচ মেয়ে নিয়ে আপনি জীবন কাটালেন। আপনার অনেক খুশি না বাজান?

হ্যাঁ, অনেক খুশি।

জয়নুল মিয়ার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হঠাৎ করে নিজের ভেতরে আনন্দের স্রোত বয়ে যাওয়া অনুভব করে। মেয়েরা তাকে ঠিকই বোঝে। ভালবাসে। যত্ন করে। তার আর কিই বা চাইবার আছে?

বাজান আপনেরে একটু দুধমুড়ি দেই?

দাও মা। খিদে পেয়েছে।

আপনিতো সকালে পান্তা না খেয়েই বাড়ি থেকে বের হলেন। কোথাও বোধহয় আর কিছু খাননি। না বাজান?

না, মা খেয়েছি।

কি খেলেন?

ওই যে পিঁপড়ার কামড়। আসল পিঁপড়া আর মানুষ পিঁপড়া। দুই পিঁপড়াই কামড় দিয়েছে।

কষ্টের কথা থাক বাজান।

বাজান মুড়ির সঙ্গে গুড় দেব?

পাটালি গুড় হলে দাও। ঝোলা গুড় দিও না।

শিউলি গুড়মুড়ি আন তে গেলে বকুলের মনে হয় ওর বাবা বোধহয় সোহেলের কাছে গিয়েছিল। নিশ্চয় বিয়ের কথা বলেছিল। সোহেল রাজি হয়নি। বাবা ওকে জিজ্ঞেস করলে ও বাবাকে বলত ওর সঙ্গে কথা না বলতে।

তখন জয়নুল জিজ্ঞেস করে, বিদেশে তুমি শক্ত থাকতে পারবে তো মা?

পারব বাজান। সোহেল আমার সঙ্গে বদমাইশি করতে পারবে না।

আলাহ্ তোমার রহম করুক মা।

শিউলি দুধমুড়ি- গুড় নিয়ে এসে বলে, বাজান খান। পাশে বসে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে বলে, বাজান আপনি কি সোহেলের সঙ্গে কথা বলেছেন?

হ্যাঁ।

ও একটা পাজি ছেলে। পাকা বুদ্ধিতে চলে।

বকুল বলেছে সোহেল ওর সঙ্গে শয়তানি করতে পারবে না।

কখন যে কি হয় বলা যায় না বাজান।

জয়নুল মিয়া চুপ করে থাকে। গ্লাসের দুধ এক চুমুকে শেষ করে। গুড়সহ একমুঠ মুড়ি মুখে দেয়। আস্তে আস্তে চিবোয়। মুড়ির ছোট টুকরিটা শিউলির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, তুই একমুঠ খা মা। আজকে তোর মা থাকলে আমার এত চিন্তা হত না। সেই সব সামলা তে পারত।

মা থাকলে সোহেলের সঙ্গে বিয়েটা হয়েই যেত। ও মায়ের সামনে না করতে পারত না।

ঠিক। ঠিক বলেছিস। তোর মায়ের অনেক তেজ। আমি তো তাকে তোয়াজ করেই চলেছিলাম। আমার মাও ওকে খুব আদর করত। একদম নিজের মেয়ের মত। তোর মাও শাশুড়ি বলতে অজ্ঞান ছিল।

আপনি অনেকবার এসব কথা বলেছেন বাজান।

এসব কথা বললে আমার ভাঙা বুক জোড়া লাগে রে। কেমন করে যে আমার এতবড় ভুলটা হয়ে গেল। জানি না। জানি না।

বাজান এসব কথা থাক।

ওই একদিনই আমি জীবনে তেজ দেখিয়েছিলাম।

শিউলি কিছু বলার আগেই দেখতে পায় উঠোন পেরিয়ে ছেলেমেয়েরা বারান্দায় উঠে এসেছে। ছোটরা চেঁচিয়ে বলে, বুবু আমরা ভাত খাব। খিদে পেয়েছে।

রান্না হয়ে গেছে। সবাই হাতমুখ ধুয়ে আয়। পদ্ম তোদের লিডার। তোরা পদ্মর কথা শুনবি।

ছেলেমেয়েরা একদৌড়ে কলতলায় যায়। জয়নুল আবেদিন ওদের দিকে তাকিয়ে বলে, আজ আমার বাড়িতে পাখির ঝাঁক নেমেছে। আজ আমার আনন্দ লাগছে।

আপনি এই আনন্দ নিয়ে আপনার মেয়েকে বিদায় দিবেন বাজান।

দেব।

মনে কষ্ট রাখবেন না তো?

মনে কষ্ট থাকবে, কিন্তু ভয় থাকবে না।

আপনি এই পাখির ঝাঁকের সঙ্গে ভাত খাবেন বাজান?

খাব। দাও, আমাকে ভাত দাও। আমার সব বোনদের ডাক। তোমারও আস।

আজ মেয়ে চলে গেল কোন এক দূর দেশে। এও অন্য এক বিদায়। আর কোনদিন দেখা হবে কিনা জানে না। তারপরও দেখা হতে পারে। একদিন ও ফিরে আসবে। জয়নুল মনে মনে আওড়ায়, ফিরে আসবে। ফিরে আসবে। খুশি হওয়ার চেষ্টা করে। পারে না। ভাবে, এও কঠিন বিদায়। যে মেয়েটি ফিরে আসবে সে আর আগের বকুল থাকবে না। জয়নুল দু'হাতে নিজের বুক চেপে রাখে।

উৎসবের মত দুপুরের খাবার খাওয়া শেষ হলে এই প্রথম বকুলের মন খারাপ হয়। বাবার দিকে তাকাতে পারে না। তাকালেই বুক ধড়ফড় করে। ও দেখতে পায় জয়নুল মিয়া ভাত খাওয়া শেষ করে এক গ্লাস পানি একটু একটু করে খাচ্ছে। যেন খেতে কষ্ট হচ্ছে। পানি তো না যেন গ্লাসে পাথরের টুকরো রাখা আছে। সেগুলো গিলতে কষ্ট হচ্ছে জয়নুল মিয়ার। বকুল আড়ালে চোখের পানি মোছে।

বিকেল যত বাড়ে তত মন খারাপ হয় বাড়ির সবার। ছোটরা নিজেরা ঘোরাঘুরি করছে। বড়রা বাড়ির ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে বা বসে কথা বলছে। জয়নুল মিয়া একা বারান্দায়। পেছনে দু'হাত রেখে শরীর ছেড়ে দিয়েছে হাতের ওপর। ঘাড় পেছনে হেলিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। বকুলের মনে হয় বাবা ওইভাবে আকাশ দেখতে পারছে না। তার ঘাড় ব্যথা হয়ে যাবে না অল্পক্ষণে! পরে ভাবে যেভাবে আছে থাকুক। সামনে মেলে রাখা পায়ের আঙুল অল্প অল্প নড়ছে। হয়তো কিছু ভাবছে, যে ভাবনার সঙ্গে এই সংসারের অনেককিছু জড়িয়ে আছে।

জয়নুল মিয়ার ভেতরটা তোলপাড় করছে। বারান্দায় বসে ঘাড় হেলিয়ে রাখলে আকাশ দেখা যায় না। জয়নুল মিয়ার আকাশ দেখার ইচ্ছা হয় না। বেলা যত বাড়ে তত তার ভয় বাড়ে। সন্ধ্যা হলেই সোহেল আসবে এই বাড়িতে। জয়নুল মিয়া বড় রাস্তা পর্যন্ত মেয়ের সঙ্গে যাবে। ওর বাস ছেড়ে দিলে বাড়িতে আসবে।

দেখবে বাড়িতে একটি মেয়ে নেই।

রাত বাড়বে। আকাশে তারা ফুটবে। চাঁদ উঠবে। পাখি ডাকবে। এমন আরও কতকিছু ঘটতে থাকবে। ঘটতেই থাকবে। জয়নুল মিয়া ঘাড় সোজা করে। পা গুটিয়ে ফেলে। দু'হাত কোলের ওপর নিয়ে আসে। শুনতে পায় পদ্ম বলছে, আমার জন্য ঝলমলে জরি বসানো জামা পাঠাতে হবে বুবু। কিপ্টামি করে কিনবি না। প্রথম মাসের বেতন পেয়েই কিনবি। সোহেল ভাইকে বলবি তোকে নিয়ে বাজারে যেতে। ঠিক আছে?

বকুল হাসতে হাসতে বলে, একশোবার ঠিক আছে। তবে–।

তবে বলে থামলে যে? তবে আবার কি?

বেতন পেয়ে সবার আগে মায়ের জন্য একটা কিছু কিনব। সোনার চুড়ি কিনব।

শিউলি চেঁচিয়ে বলে, হ্যাঁ, ঠিক বলেছে বকুল। ওর বিদেশ যাওয়ার খরচ দেবার জন্য মা কানের দুল আর গলার চেইন বিক্রি করেছিল।

তোমরা ঠিকই বলেছ।

জয়নুল এতক্ষণে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়। মেয়েদের দু'চারটে কথায় যেন তার প্রাণশক্তি ফিরে এসেছে। জয়নুল উঠোনে গিয়ে বাচ্চাদের বলে, তোদের সঙ্গে আমিও কানামাছি খেলব। তোরা গামছা দিয়ে আমার চোখে বেঁধে দে।

পদ্ম বাবার চোখ বেঁধে দেয়। জয়নুল পাগলের মত ঘুরতে থাকে। কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে খুশি তাকে ছোঁ। জয়নুল সামনে দু'হাত বাড়িয়ে ঘুরতে থাকে। কাউকে ছুঁতে পারে না। ছোটরা হই চই চেঁচামেচি করছে। জয়নুল খুশিই হয়। ভাবে কিছুক্ষণের জন্য তো শৈশব ফিরে পাওয়া গেল। ক্ষতি কি! বিকেল গড়িয়ে যায়। সবাই মিলে খেলা শেষ করে।

সন্ধ্যার পরপরই শিউলি থালায় করে ভাত মাছ নিয়ে আসে। বকুলকে মাদুরের ওপর বসায়। বাবাকে বলে, বাজান আপনে আগে বকুলরে এক লোকমা ভাত মুখে দেন। তারপর ফুফু দিবেন। তারপর অন্যরা।

বকুল হাসতে হাসতে বলে, আজকে আমার হাত ধুতে হবে না দেখছি।

পদ্ম একবাটি পানি ওর সামনে ধরে বলে, হাত তোমাকে ধুতে হবে বকুল। আমরা চার বোন তোমার হাত থেকে এক লোকমা করে ভাত খাব। আমরা শুধু খাওয়াব? তুমি খাওয়াবে না?

একশোবার খাওয়াব। আর একটা থালায় ভাত নিয়ে আয়। ভর্তি করে আনবি। আমরা পাঁচ বোন ভাগাভাগি করে খাব। মায়ের নামে এক লোকমা ভাত উঠোনে ছড়িয়ে দেব। কাকেরা খাবে।

এভাবেই বাড়ির আয়োজনের একপর্ব শেষ হয়ে যায়। দিনের আলো ফুরোয়।

সোহেল আসে বাড়িতে। ওর পেছনে পেছনে আসে ওর বাবামা-ভাইবোনেরা। বকুলের আত্মীয়স্বজনও আছে অনেকে। কেউ কেউ চলে গেছে।

জয়নুল ঘরে ঢুকে বাক্সে রাখা ফতুয়াটা বের করে গায়ে দেয়। লুঙ্গি বদলায়। চুল আঁচড়ায়। বারান্দায় বকুলের ব্যাগটি রাখা আছে। নতুন ব্যাগটি কিনে দিয়েছে শিউলি। জয়নুল ব্যাগটি হাতে তুলে নিয়ে বলে, চল মা।

বকুল সবার কাছ থেকে বিদায় নেয়। কাঁদে। হাসে। বাবাকে বাড়ির বাইরে যেতে দেখে। ছোটরা বাবার পিছে পিছে যাচ্ছে। বড়দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। জয়নুল মেয়ের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। সোহেল বেশ খানিকটা সামনে চলে গেছে। বকুল গিয়ে বাবার হাত ধরে।

বাস ছেড়ে যাওয়ার পরও রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে জয়নুল মিয়া। বিবর্ণ শূন্যতার জমাট অন্ধকার তার চোখের সামনে বিদায়ের অনুভব গাঢ় করে দেয়।

মনে পড়ে কৈশোরে বাবাকে কবরে নামিয়েছিল নিজে হাতে। আত্মীয়স্বজনরা তাকে কবরে নামতে দিতে চায়নি। ও জোর করে নেমেছিল। বলেছিল, বাজানরে নিজের হাতে কবরে রাখতে চাই। আপনেরা বাধা দিয়েন না। কৈশোরে কেমন করে এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেটা এখনও তার ভাবনার বিষয়।

রাশিদুনের চলে যাওয়া ছিল অন্যরকম। সেও এক কঠিন বিদায়। এমন বিদায়ের জের এখন পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারেনি। যাওয়ার সময় রাশিদুন ওকে কিছু বলেনি। শাশুড়ির পায়ে হাত দিয়ে সালাম করেছিল। শাশুড়ি তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলে হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল। জয়নুলের মা তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, কামটা ভালা করছ নাই।

মায়ের মৃত্যুতো সেদিনের ঘটনা বলেই মনে হয়। মায়ের কবরে নামেনি। বলেছিল, মারে আমি বিদায় দিমু না। মা আমার বুকের মধ্যে থাকুক।

আজ মেয়ে চলে গেল কোন এক দূর দেশে। এও অন্য এক বিদায়। আর কোনদিন দেখা হবে কিনা জানে না। তারপরও দেখা হতে পারে। একদিন ও ফিরে আসবে।

জয়নুল মনে মনে আওড়ায়, ফিরে আসবে। ফিরে আসবে। খুশি হওয়ার চেষ্টা করে। পারে না। ভাবে, এও কঠিন বিদায়। যে মেয়েটি ফিরে আসবে সে আর আগের বকুল থাকবে না। জয়নুল দু'হাতে নিজের বুক চেপে রাখে।

• পরবর্তী সংখ্যায়

সেলিনা হোসেন কথাসাহিত্যিক

জীবাণু থেকে সুরক্ষায়
ডেটল গোসল প্রতিদিন!

Dettol

BE 100% SURE

বেছে নিন আপনার পছন্দের ডেটল সাবান

PRIVATE MEDICAL PRACTITIONERS ASSOCIATION BANGLADESH ESTD 1977
*BPMPA

ডাক্তারদের দ্বারা স্বীকৃত
বাংলাদেশের একমাত্র সাবান

www.dettol.com.bd
facebook.com/dettolbd

ভ্রমণ

কেরালা

এক মোহবিস্তারী সৈকতভূমি

বিবেক টলগ্রেন

ভারতের অন্যতম ক্ষুদ্র সম্পদশালী রাজ্য কেরালা। ভারতের দক্ষিণে আরব সাগরের তীরে সর্বশেষ ক্ষুদ্র ভূখণ্ডটির নাম কেরালা। ১৯৫৬ সালে রাজার শাসনাধীন তদানীন্তন ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন এবং ব্রিটিশ উপনিবেশ মালাবারকে একত্রিত করে কেরালার জন্ম। কেরালার অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র কোভালাম সমুদ্রসৈকতকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমুদ্রসৈকত বলে মনে করা হলেও, ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এই রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ভূচিত্র, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি আরও বেশি আকর্ষণীয়। কেরালাকে প্রায়শই ভারতের উদ্যান বলা হয়ে থাকে এর উর্বর জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য। দিগন্তবিস্তৃত উর্বর সবুজ ধানের খেত এবং যতদূর চোখ যায় নারকেল গাছের সারির মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে স্বচ্ছতোয়া নদীগুলো। স্থানীয় ভাষা মালয়ালমে নারকেল গাছকে বলা হয় কল্পবৃক্ষ অর্থাৎ জীবনবৃক্ষ। স্থানীয় মানুষ নারকেল ব্যবহার করেন অগণিত উপায়ে। নারকেলের শাঁস স্থানীয় স্বাদু খাবারে ব্যবহৃত হয় এবং আতিথেয়তার ক্ষেত্রে নারকেলের দুধ পরিবেশন করা হয়ে থাকে। কেরালাবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে নারকেল তেল বহুভাবে ব্যবহৃত হয়। ত্বক ও চুলের প্রসাধনী হিসেবে এবং প্রদীপ ও মন্দিরের বিভিন্ন শাস্ত্রীয় আচারেও নারকেল তেল ব্যবহৃত হয়। নারকেল ছোবড়া থেকে তৈরি দড়ি দিয়ে পাপোশ প্রস্তুত করা কেরালার স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। নারকেলের খোলা থেকেও রান্নাঘরের বিভিন্ন পাত্র, খেলনা ও অন্যান্য জিনিস তৈরি করা হয়। কেরালা বিভিন্ন মশলাদ্রব্যের ভূমি। ভারতের ৯৫ শতাংশ গোলমরিচ, ৭৫ শতাংশ ছোট এলাচ ও দারুচিনি, আদা, জায়ফল, লবঙ্গ এখানেই উৎপন্ন হয়।

কেরালার প্রাকৃতিক সম্পদ শতাব্দীকাল ধরে ব্যবসায়ীদের আকর্ষণ করে আসছে। এ অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মের সমাগম হয়েছে শুধু এ কারণেই। কেরালায় আজও বিভিন্ন ধর্মের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ছাড়াও প্রায় ২০ শতাংশ খ্রিস্টান, ১৮ শতাংশ মুসলিম এবং অল্পসংখ্যক ইহুদি সম্প্রদায়ের বসবাস কেরালায়।

রাজধানী ত্রিবান্দ্রামের উত্তরাংশে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোচিন শহর অবস্থিত এবং এ শহর ভারতের অন্যতম চিত্তাকর্ষক শহর এবং কেরালার সমৃদ্ধ ইতিহাসের সব থেকে বড় আকর। ঔপনিবেশিক ঘরানার বহু ভবন পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ শাসনের বিচিত্র ইতিহাসের সাক্ষি। বন্দর থেকে এগিয়ে এলে দেখতে পাওয়া যায় লম্বা মাছ ধরার চিনা জাল। এটি কুবলাই খানের রাজপ্রাসাদ থেকে চিনা ব্যবসায়ীরা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কোচিনে আনেন।

কোচিনে অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান, প্রাচীন সেন্ট ফ্রান্সিস গির্জা। ১৫০৩ সালে এটি নির্মাণ করেন পর্তুগিজ ফ্রান্সিসী ধর্মসম্প্রদায়ের সদস্যবৃন্দ। বিখ্যাত পর্তুগিজ অভিযাত্রী ভাস্কো-ডা-গামা মালাবার উপকূলে তিনবার পাড়ি জমান। ১৫২৪ সালে ভাইসরয় হিসেবে তিনি ভারতে ঔপনিবেশিক ক্ষমতা পুনঃসংগঠিত করার নির্দেশ পান। অত্যাচার ও নিপীড়ন ছাড়াই তিনি তা করেছিলেন কিন্তু সে বছরেই তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর নশ্বর দেহ সেন্ট ফ্রান্সিস গির্জায় সমাহিত করা হয়। তার শারীরিক অবশেষ পরে লিসবনে স্থানান্তরিত করা হয়। ভারতে ইংরেজ আগ্রাসনের পরে এই গির্জাটি ১৭৯৫ সালে ইংল্যান্ডের সরকারি ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

কেরালার খ্রিস্টানদের ইতিহাস অবশ্য আরও প্রাচীন এবং তার উদ্ভব হয় সাইরো টমাসের মাধ্যমে। কিংবদন্তিতে প্রকাশ, প্রচারক সেন্ট টমাস ৫২ খ্রিস্টাব্দে এখানে মিশনারি হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং ভক্তগোষ্ঠী তৈরি করেন। চতুর্থ শতকে নির্যাতন ও পরে পারস্য থেকে লোকজনের চলে আসার ফলে খ্রিস্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ভাস্কো-ডা-গামার সময় কেরালায় দুই লাখ খ্রিস্টান ছিলেন। কোচিনে সমগ্র কমনওয়েলথের প্রাচীনতম সিনাগগটি অবস্থিত। পুরাতন ইহুদি কোয়ার্টার জু টাউনে এই ধর্মস্থানটি নির্মিত হয়েছিল ১৫৬৮ সালে। এটি মশলা বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্রও ছিল। ইহুদিরা আজ কেরালার ক্ষুদ্রতম ধর্মীয় সম্প্রদায় হলেও মালাবার উপকূলীয় অঞ্চলে তাদের ইতিহাস খ্রিস্টানদের মতই প্রাচীন। চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী কেরালার ইহুদিরা দু'টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত– সাদা ইহুদি আর কালো ইহুদি। জেরুজালেম ধ্বংস হবার পরে রোমানদের অত্যাচারে জুডেয়া থেকে চলে আসা ইহুদিরা হলেন সাদা ইহুদি। মনে করা হয়, কালো ইহুদিরা খ্রিস্টীয় শতকের শুরুর বহু আগেই ইয়েমেন এবং ব্যাবিলন থেকে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। সাদা ইহুদিদের মতে, কালো ইহুদি (যাদের ত্বক কালো এবং কেরালার স্থানীয়

মানুষজনের ত্বকের বর্ণের মত) আসলে মালয়ালি ভূমিদাস প্রথার উত্তরসূরি, ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত হবার পরে স্বাধীন হয়।

১৯৫৭ সালে কেরালায় এক অনবদ্য ঘটনা ঘটে। কেরালা বিশ্বের প্রথম কোনও কমিউনিস্ট সরকারকে নির্বাচিত করে। কমিউনিস্টরা এখন যদিও ক্ষমতায় নেই কিন্তু সামাজিক সংস্কারের ছাপ কেরালার সর্বত্র বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ, সাক্ষরতা অভিযানে কেরালা সব থেকে ভাল ফল করে ভারতীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেছে। কেরালার সাক্ষরতার হার ১০০ শতাংশ।

কেরালার আত্মা হল তার প্রাচীন মুকাভিনয়পূর্ণ নৃত্যনাট্য কথাকলি যা রামায়ণ ও মহাভারতের মত মহাকাব্য ও জনপ্রিয় নৃত্য ও ধর্মীয় আচার থেকে অনুপ্রাণিত। উদ্ভাবনী প্রকৃতির নৃত্য হওয়ায় চিরাচরিত কথাকলি নৃত্য প্রায় সারা রাত ধরে চলে। পর্যটকদের জন্য এ নৃত্য আজকাল এক ঘণ্টার মধ্যেও শেষ করা হয়। নৃত্য প্রদর্শনের পূর্বে দর্শকরা নৃত্যশিল্পীদের সাজ দেখার অনুমতি পান। শিল্পীরা সবাই পুরুষ। তাদের মুখাবয়বে রঙ লাগানোর কাজে বেশ কয়েক ঘণ্টা লাগে। রঙ করা শেষ হলে মুখগুলো আসুরিক হয়ে ওঠে। চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী মুখের প্রাথমিক রঙটি হয় গাঢ় সবুজ এবং চোখের ওপর লাল রঙ।

'মুদ্রা' (হস্ত সঞ্চালন) এবং চোখের সঞ্চালন কথাকলি নৃত্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যান। বলা হয় যে, কথাকলি নৃত্যের শিল্পী মানুষের অন্তরের অনুভবকে তার মুখে প্রতিফলিত করেন। কথাকলি নৃত্যে শিল্পীর উদ্দেশ্য হল তার পেশী ও হাড়ের সঞ্চালনের উর্ধ্বে তার শারীরিক ও মুখের প্রকাশভঙ্গিমার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখা। এ নৃত্য শিখতে ছয় বছর সময় লাগে এবং এর মধ্যে যোগ ও আয়ুর্বেদের জ্ঞানও অর্জন করতে হয়।

কথাকলি শুধুমাত্র নৃত্যই নয়, এটি একটি ধর্ম ও দর্শন, যার উদ্দেশ্য হল শান্তি ও জীবনের সুরসংগতি। অধিকাংশ পুরাণ বা মহাকাব্যের মত এই নৃত্যনাট্যের মূল বিষয় হল শুভ ও অশুভের মধ্যে লড়াই এবং পরিশেষে শুভশক্তির অবশ্যম্ভাবী জয়। পর্যটকদের কাছে কথাকলি এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা।

সূত্র **ভারত প্রসঙ্গ**

বিবেক টলগ্রেন
ভারত সফরকারি ফিনল্যান্ডের শিক্ষাবিদ

প্রবন্ধ

কাজী নজরুল ইসলামের গজল

করুণাময় গোস্বামী

(পূর্ব প্রকাশিতর পর)

শেয়র ব্যবহারের উপলব্ধিগত ও সাংগীতিক তাৎপর্য আছে। তাল ছন্দে ছন্দে গানকে চলমান রাখে। কোন কথার ওপর বা গানের অংশবিশেষের ওপর সে সুরকে অচঞ্চলভাবে স্থিত হতে দেয় না। তালযুক্ত অবস্থায় সুরের স্থিতিকে দীর্ঘ করলেও এক ধরনের গতিবেগ তাতে থেকেই যায়। কিন্তু গভীরভাবে ভাববাহী কোন স্তবকে বা স্তবকাংশে সুর গতিমুক্ত অবস্থায় প্রয়োগ করলে তাতে ভাবনার স্ফুটন গভীরতর হয় এবং পদবাহিত ব্যঞ্জনাকে নিঙড়ে বের করে আনা যায়। এ হচ্ছে গজলে শেয়র ব্যবহারের উপলব্ধিগত দিক। এর সাংগীতিক দিকটিও উলেখযোগ্য। তালের কাঠামোয় বসানো একটি গানের অংশবিশেষে এসে তালসঙ্গত ছেড়ে সুরাবৃত্তির ঢঙে গাইলে সেই অংশবিশেষের ওপর শ্রোতৃচিত্ত গভীরভাবে আকৃষ্ট হয় এবং পর পরই তালে ফিরে গেলে গানের গতিও বজায় থাকে, বৈচিত্র্যও সম্পাদিত হয়; এক প্রকার নাটকীয়তার আস্বাদও পাওয়া যায় তাতে। এইভাবে গতিছন্দ ও গতিছন্দহীনতার বৈপরীত্যে চিত্তাকর্ষক সাংগীতিক সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। বাংলা কাব্যসংগীতে এ জিনিসটি ছিল না। শেয়রের মাধ্যমে গীতমধ্যস্থ সুরাবৃত্তির চালটি যখন নজরুল উপস্থাপিত করলেন, তখন যেন একটি নতুন ধরনের সাংগীতিক নান্দনিকতার মুখোমুখি হল বাঙালি গীতরসিক সমাজ।

নজরুলের গজলে শেয়র প্রয়োগ প্রসঙ্গে রাজ্যেশ্বর মিত্র বলেছেন: 'নজরুল আর একটি জিনিসের প্রবর্তন করেন আমাদের সংগীতে, সেটি ইচ্ছে 'শেয়র' বা সুরসহযোগে কাব্যপাঠ। এই সুরের ভঙ্গির সঙ্গে আমাদের কথকতার ভঙ্গির অনেক তফাৎ; কেন-না এ হচ্ছে গেয় লিরিক বা কাব্যবন্ধেরই একটা অঙ্গ। গানের মতই এর সুরের সঞ্চরণ এবং প্রকৃতি খানিকটা আলাপঘেঁষা। এই শস্নথ ভঙ্গিতে সুর করে আবৃত্তি করবার পর তালের প্রয়োগ এবং ছন্দের

ঝোঁক একটি অপরূপ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসাবে নজরুলের দু'টি বিখ্যাত গানের উলেখ করা যায়, একটি 'দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি ভিখারিণী', অপরটি 'পানসে জোছনাতে কে চল গো পানসী বেয়ে।' তিনি কিভাবে শেয়র প্রয়োগ করেছেন সেটি নিম্নোদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হবে। এটি 'পানসে জোছনাতে' গানটির দ্বিতীয় কলি–

ওপারে লুকিয়ে আঁধার, গভীর ঘন বনছায়
আকাশে হেলান দিয়ে আলসে পাহাড় ঘুমায়।
ঘুমায়ে দূরে সে কোন গ্রামবাসরে পলীবধূর প্রায়
ওপা রে ধূ ধূ বালুচর যেন নদীর আঁচল লুটায়।

এই চিত্রটি তিনি তুলে ধরেছেন সুরের চমৎকার আবৃত্তির মাধ্যমে, তালে সেই চমৎকারিত্বকে কিছুতেই তিনি ব্যক্ত করতে পারতেন না। এই প্রয়োগগুলি যেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে, আধুনিক গানের বিবিধ কলাকৌশলের মাঝখানে এইসব গায়নভঙ্গির সাক্ষাৎ মেলে না। উর্দু বা হিন্দি কাব্য পাঠে এবং গানে এই ধারা এখনও অব্যাহত আছে।' (রাজ্যেশ্বর মিত্র, সাপ্তাহিক *দেশ*: কলকাতা ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, পৃষ্ঠা ৪৪)

'পানসে জোছনাতে কে চল গো পানসী বেয়ে' গানটির সম্পূর্ণ পাঠ হচ্ছে:

পানসে জোছনাতে কে চল গো পানসী বেয়ে।
ঢেউএর তা লে তালে বাঁশীতে গজল গেয়ে॥
মেঘের ফাঁকে ফোটে বাঁকা শশীর চিকন হাসি
উজান বেয়ে চল তুমি কি তার চোখে চেয়ে॥
ওপারে লুকিয়ে আঁধার গভীর ঘন বনছায়
আকাশে হেলান দিয়ে আলসে পাহাড় ঘুমায়।
ঘুমায়ে দূরে সে কোন গ্রামবাসরে পলীবধূর প্রায়
ওপারে ধূ ধূ বালুচর যেন নদীর আঁচল লুটায়।
ছাড়ি এ সুখবাস চলেছ কোথায় গো নেয়ে॥
নদীর দু'তীরে টানে বেতসলতা উ ত্তরীয়
চম্‌কি উঠি চখী ডাকে মুহু মুহু 'কিও।'
চকোরী চাঁদে ভুলি চাহে তব মুখপানে
কেঁদে পাপিয়া শুধায় 'পিউ কাঁহা কাঁহা পিও।'
তুমি যাও আপনবি ভোল স্বপনে নয়ন ছেয়ে॥

এই গানের 'ওপারে লুকিয়ে আঁধার... যেন নদীর আঁচল লুটায়' ও 'নদীর দু'তীরে টানে... পিউ কাঁহা কাঁহা পিও' অংশ দু'টি শেয়র। দেখা যায় যে গানের এ দু'টি অংশেই চিত্ররূপের গভীরতা প্রতিফলিত হয়েছে। এর প্রতি মনকে নিবিষ্ট করে তুলতে আবৃত্তিমূলক গায়ন যতটা কার্যকর, তালযুক্ত গায়ন ততটা কার্যকর নয়। কারণ সুরাবৃত্তিতে অন্তর্মুখিতা রূপায়ণের কার্যকারিতা অনেক বেশি। 'দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি ভিখারিণী' গানটির উলেখ করেছেন রাজ্যেশ্বর মিত্র। গানটি হচ্ছে:

দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি ভিখারিণী।
গাহিয়া সজল চোখে বেলা-শেষের রাগিণী॥
মিনতিভরা আঁখি কে তুমি ঝড়ের পাখি
কি দিয়ে জুড়াই ব্যথা কেমনে কোথায় রাখি।
কোন প্রিয় নামে ডাকি মান ভাঙাব মানিনী॥
বুকে তোমায় রাখতে প্রিয় চোখে আমার বারি ঝরে
চোখে যদি রাখতে চাই বুকে ওঠে ব্যথা ভরে।
যত দেখি তত হায় পিপাসা বাড়িয়া যায়
কে তুমি যাদুকরী স্বপন মরুচারিণী॥

এই গানটির 'মিনতিভরা আঁখি... কেমনে কোথায় রাখি' ও 'বুকে তোমায় রাখতে প্রিয়... পিপাসা বাড়িয়া যায়' অংশ দু'টি শেয়র। এখানেও গানের ব্যঞ্জনাগভীর চরণসমূহকেই শেয়র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। 'জাগো জাগো রে মুসাফির' গানখানির উদাহরণ গ্রহণ করা যায়:

জাগো জাগো, রে মুসাফির। হয়ে আসে নিশি ভোর।
ডাকে সুদূর পথের বাঁশী, ছাড় মুসাফিরখানা তোর॥
অস্তআকাশ অলিন্দে ঐ পাণ্ডুর কপোল রাখি
কাঁদে মলিন ভোরের শশী, বিদায় দাও বন্ধু চকোর॥
পেয়েছিলি আশ্রয় শুধু পাসনি হেথায় স্নেহনীড়
হেথায় শুধু বাজে বাঁশী উদাস সুরে ভৈরবীর
তবু কেন যাবার বেলা ঝরে রে তোর নয়ন-লোর
মরুচারী খুঁজিস সলিল অগ্নিগিরির কাছে হায়
খুঁজিস অমর ভালবাসা এই ধরণীর এই ধূলায়।
দারুণ রোদের দাহে খুঁজিস কুঞ্জছায়া-স্বপ্নঘোর॥

এ গানটিরও অস্তআকাশ... বন্ধু চকোর' ও 'মরুচারী খুঁজিস সলিল... এই ধরণীর এই ধূলায়' এই দু'টি ভাবগভীর অংশকেই শেয়র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এমনিভাবে 'দিতে এলে ফুল, হে প্রিয়', 'একি সুরে তুমি গান শোনালে', 'বিরহের গুলবাগে মোর ভুল করে আজ' প্রভৃতি গজলে শেয়রের ব্যবহারে শুধু সাংগীতিক সৌন্দর্য সম্পাদিত হয়নি, উপলব্ধিগত সৌকর্যও অর্জিত হয়েছে। 'পথ চলিতে যদি চকিতে', 'ছাড় ছাড় আঁচল', 'তোমার কুসুমবনে', 'ঐ ঘরভুলানে সুরে', 'গুলবাগিচায় বুলবুলি আমি', 'চেয়ো না সুনয়না আর চেয়ো না' প্রভৃতি গজলে শেয়রের ব্যবহার মুখ্যত সাংগীতিক। এর দ্বারা এইসব গানের গায়নকলায় বৈচিত্র্য ও নাট্যরস সংযোজিত হয়েছে।

গজলের কাব্যসাংগীতিক আদর্শের সঙ্গে শেয়রের ব্যবহার যে কত সঙ্গতিপূর্ণ এবং তাতে গানের সুষমা যে কি তাৎপর্যপূর্ণভাবে ফুটে উঠতে পারে, নজরুলের গজল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

লঘু রাগসংগীতরূপে গজলের সংগীতরূপটি ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কাজী নজরুল ইসলামও হিন্দুস্তানী রাগসংগীতের ব্যাপক প্রেক্ষাপটে গজল রচনা করেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে তাঁর জীবনের গ্রামোফোন কোম্পানিপর্ব শুরু হবার পূর্ব থেকেই নজরুল রাগসংগীত সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। জানা যায় যে গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগ দেবার পর পরই তিনি রাগসংগীত সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে উৎসাহী হন। সে সময় তিনি ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ওস্তাদ কাদের বখস, মঞ্জু সাহেব, জ্ঞান গোস্বামী প্রমুখের সাহচর্যও নজরুলের রাগসংগীতজ্ঞান পরিপুষ্ট হতে সাহায্য করে। এর আগেকার সময়ে রাগসংগীত সম্পর্কে নজরুলের প্রস্তুতি গ্রহণের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তা পাওয়া না গেলেও গজল নামক লঘুরাগ সংগীতবন্ধ সম্পর্কে তাঁর ধারণা এবং গজলে রাগসুরের রূপসম্মত ও রসসম্মত ব্যবহার থেকে একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগদানের বহু পূর্ব থেকেই রাগসংগীত সম্পর্কে নজরুলের প্রস্তুতি চলছিল। তা না হলে রাগসুরের এমন ব্যাপক ও চিত্তাকর্ষক ব্যবহার তিনি করতে পারতেন না। প্রকৃতপক্ষে করাচি ব্যারাকে থাকতেই নজরুল রাগসংগীত সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে ব্রতী হন। *সওগাতে* ছাপাবার জন্য প্রথম যে গানটি তিনি পাঠিয়েছিলেন সেটিও বসন্ত সোহিনী রাগে রচিত হয়েছিল। করাচি থেকে কলকাতা ফেরার পর বিদ্রোহী নজরুলের যে প্রবল বহির্মুখী কর্মতৎপরতার জীবন, তার অন্তরালেও একটি গভীর অন্তর্মুখী সাংগীতিক প্রস্তুতির পর্ব চলছিল। গজল রচনা তারই ফলশ্রুতি।

ভৈরবী নজরুলের গজলে সর্বাধিক ব্যবহৃত রাগ। তালের মধ্যে কাহারবা ও দাদরা। তবে কাহারবার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। নিচে নজরুল রচিত কিছু উলেখযোগ্য গজলে ব্যবহৃত রাগতাল নির্দেশিত হল:

বাগিচায় বুলবুলি তুই: ভৈরবী, কাহারবা
আমারে চোখ ইশারায়: জৌনপুরীআশাবরী, কাহারবা
বসিয়া বিজনে কেন একা মনে: ইমন মিশ্র, কাহারবা
ভুলি কেমনে আজো যে মনে: পিলু, কাহারবাদাদরা
কেন কাঁদে পরাণ কি বেদনায়: মিশ্র বেহাগখা স্বাজ, দাদরা
মৃদু বায়ে বকুল ছায়ে: সিন্ধু-ভৈরবী, কাহারবা
কে বিদেশী মন উদাসী: ভৈরবীআশাবরী, কাহারবা
করুণ কেন অরুণ আঁখি: সিন্ধু, কাওয়ালী
এত জল ও কাজল চোখে: মান্দ, কাওয়ালী
আসে বসন্ত ফুলবনে: ভীমপলশ্রী, দাদরা
দুরন্ত বায়ু বহে পূরবইয়া: কাফিসি স্কু, কাহারবা
চেয়ো না সুনয়না আর চেয়ো না: বাগেশ্রীপিলু, কাহারবা
নিশি ভোর হল জাগিয়া পরাণপিয়া: ভৈরবী, কাহারবা
কেন দিলে এ কাঁটা যদি না কুসুম দিলে: বেহাগ, দাদরা

গজল দুই তুক বা স্তবকবিশিষ্ট রচনা। স্থায়ী ও অন্তরা এই দুই স্তবকে গজল গঠিত হয়। প্রথম স্তবকটি স্থায়ী এবং পরবর্তী সকল স্তবক অন্তরা। তবে গজলরূপে উলিখিত নজরুলের গানে দুই তুকের স্থলে একটি তৃতীয় তুকের সন্ধান পাওয়া যায়। অন্তরাসমূহের সুর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুনরাবৃত্তিমূলক। যাকে সুরবৈচিত্র্য বলা হয় গজলে তার সুযোগ অল্প।

সখি বলো বধূয়ারে নিরজনে: খাম্বাজমিশ্র, দাদরা
নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল: দুর্গা, কাওয়ালী
এ আঁখিজল মোছ পিয়া: ভৈরবী, কাওয়ালী
আসিলে এ ভাঙা ঘরে: পিলু-ভৈরবী, কাহারবা
কেন আন ফুলডোর আজি: ভীমপলশ্রী, কাহারবা
কেমনে রাখি আঁখিবারি চাপিয়া: রাতের দুর্গা, আদ্ধা কাওয়ালী
কেন আসিলে যদি যাবে চলি: দিনের দুর্গা, আদ্ধা কাওয়ালী
মুছাফির! মোছরে আঁখিজল ফিরে চল: বারোয়াঁ, কাহারবা
এ নহে বিলাস বন্ধু ফুটেছি জলে কমল: মান্দ, কাহারবা
মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর: ভৈরবী, দাদরা
কেউ ভোলে না কেউ ভোলে: মান্দ, কাহারবা
যাও তুমি ফিরে: ভৈরবী, দাদরা
ফাগুন রাতের ফুলের নেশায়: পিলু, কাহারবা
এল ফুলের মরশুম: পাহাড়ী, দাদরা
আনো সাকী শিরাজী আনো: ভৈরবী, সেতারখানি
শূন্য আজি গুল বাগিচা যায় কেঁদে দখিন হাওয়া: কাফি মিশ্র, কার্ফা
তোমার আঁখির কসম সাকী: পিলু মিশ্র, কার্ফা
বিরহের গুলবাগে মোর ভুল করে: পাহাড়ী মিশ্র, রূপক
ঐ ঘর ভোলানো সুরে: পিলু-ভৈরবী, কার্ফা
একি সুরে তুমি গান শোনালে: ভৈরবী, দাদরা
পানসে জোছনাতে কে চল গো: পিলুখা স্বাজ মিশ্র, দাদরা
কোন বন হতে: জংলা, কার্ফা
নিশীথ হয়ে আসে ভোর: ভৈরবী মিশ্র, কার্ফা
প্রিয় যাই যাই বলো না: গারামিশ্র, দাদরা
দিতে এলে ফুল হে প্রিয়: যোগিয়ামিশ্র, কার্ফা
গুলবাগিচার বুলবুলি আমি: সিন্ধুকাফিলাউনি, কাহারবা
পথ চলিতে যদি চকিতে: বারোয়াঁ মিশ্র, কার্ফা
চোখের নেশা ভালবাসা: বাগেশ্রী, কার্ফা
শিউলী ফুলের মালা দোলে: সিন্ধুমিশ্র, কার্ফা
আধো আধো বোল লাজে: ভৈরবীপিলু, কার্ফা
দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি: পাহাড়ী মিশ্র, দাদরা
যাও তুমি ফিরে: ভৈরবী, দাদরা

গজল দুই তুক বা স্তবকবিশিষ্ট রচনা। স্থায়ী ও অন্তরা এই দুইস্তবকে গজল গঠিত হয়। প্রথম স্তবকটি স্থায়ী এবং পরবর্তী সকল স্তবক অন্তরা। তবে গজলরূপে উলিখিত নজরুলের গানে দুই তুকের স্থলে একটি তৃতীয় তুকের সন্ধান পাওয়া যায়। অন্তরাসমূহের সুর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুনরাবৃত্তিমূলক। যাকে সুরবৈচিত্র্য বলা হয় গজলে তার সুযোগ অল্প। যোগ্য গায়করা তাদের ক্রিয়াপর ও রসসম্মত গায়কী দ্বারা যেটুকু বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন তাতেই গজলের আকর্ষণীয়তা বজায় থাকে। সুরে ও লয়ে বাণীমাধুর্যকে পরিস্ফুট করে তোলার মধ্যে গজল রূপায়ণের মূল সাংগীতিকতা নিহিত থাকে। তাই আবৃত্তিধর্মী হয়ে ওঠাই গজলের মূল স্বভাব। এক্ষেত্রে প্রধান সাংগীতিক ব্যাপারটি হচ্ছে একটি চিত্তাকর্ষক সুরনকশা গ ড়ে তোলা, যে নকশাটি স্থায়ীঅ ন্তরাকে বহন করে চলে। গজলের জন্য নজরুল চমৎকার সব সুরনকশা তৈরি করেছিলেন। এক ভৈরবীতেই কত ধরনের নকশা। বাগিচায় বুলবুলি, নিশি ভোর হল, এ আঁখিজল মোছ পিয়া, কি হবে জানিয়া বল, মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর, যাও তুমি ফিরে প্রভৃতি গজলে একই ভৈরবীতে কত ধরনের নকশা সুরের। তেমনি পিলু, খাম্বাজ, কাফি প্রভৃতি গজলোচিত রাগেও কত বৈচিত্র্যময় সুরনকশা রচনা ক রেছেন নজরুল।

বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের গজলের সংযোজনমূলক অবদানের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে রাজ্যেশ্বর মিত্র বলেছেন: 'কাব্যসংগীতের প্রথম যুগে নজরুল প্রবৃত্ত হয়েছিলেন গজল রচনায়। সম্ভবত তৎকালীন *কল্লোল* পত্রিকায় তিনি এই ধরনের কয়েকটি গজল প্রকাশ করেন। এই গজল গানের দু'একটি গ্রামোফোন রেকর্ড বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রসিক শ্রোতাদের মন কেড়ে নিলেন। বাংলার সংগীতে এই রীতি সম্পূর্ণ নূতন। এত বড় একটি অভিনব সংযোজনের জন্য তিনি প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু বাংলা গানের অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে কত বড় সম্ভাবনা তিনি ভবিষ্যতের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন এ সম্বন্ধে সে রকম আলোচনা সেদিনও হয়নি, আজও হয়েছে বলে মনে পড়ে না। অপরাপর কাব্যসংগীতে নজরুল একজন সুস্থ, সমুজ্জল, পরিচ্ছন্ন, সুরকারমাত্র, কেননা তাঁর আ গে এই ধরনের রচনা বহু হয়েছে, কিন্তু গজলের পরিকল্পনা একমাত্র তাঁরই এবং তাঁর পরে সেই সার্থকতা আর কেউ দাবী করতে পারেন বলে মনে হয় না। অতুলপ্রসাদ দু'একটি উত্তম গজল রচনা করছেন, কিন্তু নজরুলের এদিকে একটা বিশেষ অ্যাকাডেমিক চিন্তা ছিল যার প্রমাণ তিনি বহু গানে রেখে গেছেন।...

'গজলের এই যে ধারাকে তিনি নিয়ে এলেন তাকে কিন্তু তিনি আরও উচ্চতর ভাবাদর্শে স্থাপন করতে সচেষ্ট হননি, শীঘ্রই তাঁর গানের মোড় অন্য দিকে ঘুরে গেল। গত শতাব্দীতে যাঁরা টপ্পা রচনা করেছিলেন তাঁরা যেমন বাংলা টপ্পাকে একটা বিশেষ আর্টে পরিণত করেছিলেন নজরুল তেমনিভাবে গজল পর্যায়ের বাংলা গানকে একটা বিশেষ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করবার জন্য সচেষ্ট হননি। তিনি যেন কয়েকটি এক্সপেরিমেন্ট করেই থেমে গেলেন। ফারসিতে গজল মানিয়ে গেছে সে-দেশের জীবনযাত্রা, আচারব ্যবহার, ভাষার স্বাভাবিক গতিপ্র কৃতির সঙ্গে। উর্দুতে সেই রীতি সমানভাবে প্রযোজ্য হয়নি। তাই উর্দু গজলের সঙ্গে ফারসি গজলের যেমন মিল আছে, তেমনি তফাৎও অনেকখানি। ক্রমে উর্দু সংগীতসাহিত্য গজলকে নিজের নিয়মে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে নিয়েছে এবং এদিকে তাদের প্রয়াস চলেছে গভীরভাবে। বাংলার জীবনযাত্রায় সুরা, সাকী, সরাইখানা, বিচিত্র পেয়ালায় পানশালায় বসে একত্রে পান ভোজন ইত্যাদি ব্যাপার একেবারেই বিজাতীয়, তাই ঠিক সেই ধারায় রচনা করলে নতুনত্বের একটা আশ্চর্য স্বাদ পাওয়া যাবে বটে কিন্তু তার বেশি কিছু স্থায়ী হবে না। নজরুলের ক্ষেত্রে এটাই প্রধানত ঘটেছে, তাই গজলের গতি যেন খানিকটা প্রবাহিত হয়েই অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। অথচ বহু ইসলামী ভাবধারা তো আমাদের সংগীতে ওতপ্রোতভাবে যুক্তও হয়ে গেছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে সুফী ভাবধারা। সেগুলি এসেছে স্বাভাবিক চিন্তা ও প্রয়োগের মাধ্যমে, তাদের সঙ্গে আমাদের বহু সম্প্রদায়েরও ভাবাদর্শের দিক থেকে মিল ছিল। তথাপি নজরুলের এই বিচিত্র সৃষ্টির মূল্যও কম গভীর নয়, আর্টের দিক থেকে এর একটা বিরাট স্বীকৃতি সর্বদাই থাকবে এবং এই যে পরীক্ষানিরী ক্ষা তিনি করে গেলেন তা অসাধারণ সম্ভাবনার পরিচায়ক। বাংলায় যে গজল রচিত হয়েছে এবং তাকে গভীরতর পর্যায়ে নিয়ে যাবার অবকাশ যে প্রচুর আছে, এটা আমরা আজ বলতে পারি নজরন্নলের প্রয়াসের উপর ভিত্তি স্থাপন করে।' (রাজ্যেশ্বর মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪২৪৩)

'শীঘ্রই তাঁর গানের মোড় অন্যদিকে ঘুরে গেল', রাজ্যেশ্বর মিত্রের এ মন্তব্য যথার্থ, কেননা গজল রচনায় ব্রতী হবার পর পরই নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হন এবং সে থেকে কোম্পানির চাহিদামত তাঁকে নানা ধরনের গান রচনা, সুর যোজনা ও প্রশিক্ষণ দানের কাজে নিয়োজিত থাকতে হয়। ফলে এই নবসৃষ্ট সংগীতধারার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেবার অবকাশ তিনি পাননি। তা বলে গজল

কাজী নজরুল ইসলাম নিজেই তাঁর গজলের প্রবাহকে ধারণ করে বাংলা কাব্যসংগীতের এক যুগপ্রতিভূরূপে অবস্থান করলেন। এই ইঙ্গিতও তাঁর রচনায় থাকল যে গজলের ধারা অবলম্বনে বাংলা কাব্যসংগীতের ক্ষেত্রে গভীর কিছু করার অবকাশ আছে প্রচুর। একাজে ভবিষ্যতে যাঁরাই ব্রতী হোন না কেন, কাজী নজরুল ইসলাম হবেন তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়।

তিনি পরিত্যাগ করেননি। গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগদানের পরও নজরুল বেশ কিছু চমৎকার গজল রচনা করেছেন। উনিশ শতকের টপ্পা রচনার সঙ্গে তুলনা করে নজরুলের গজল রচনা সম্পর্কে রাজ্যেশ্বর মিত্র বলেছেন, 'গত শতাব্দীতে যাঁরা টপ্পা রচনা করেছিলেন, তাঁরা যেমন বাংলা টপ্পাকে একটা বিশেষ আর্টে পরিণত করেছিলেন, নজরুল তেমনিভাবে গজলপর্যায়ের বাংলা গানকে একটা বিশেষ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করবার জন্য সচেষ্ট হননি। তিনি যেন কয়েকটি এক্সপেরিমেন্ট করেই থেমে গেলেন।' এর কারণ, তাঁর মতে, 'বাংলার জীবনযাত্রায় সুরা, সাকী, সরাইখানা, বিচিত্র পেয়ালায় পানশালায় বসে একত্রে পান-ভোজন ইত্যাদি ব্যাপার একেবারেই বিজাতীয়, তাই ঠিক সেই ধারায় গজল রচনা করলে নতুনত্বের একটা আশ্চর্য স্বাদ পাওয়া যাবে বটে, কিন্তু তার বেশি কিছু স্থায়ী হবে না। নজরুলের ক্ষেত্রে এটাই প্রধানত ঘটেছে, তাই গজলের গতি যেন খানিকটা প্রবাহিত হয়েই অবরুদ্ধ হয়ে গেছে।'

একথা সত্য যে নিধুবাবুকালী মীর্জা প্রবর্তিত টপ্পার ধারা বাংলা সংগীতসাহিত্যে ব্যাপকভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত হয়েছিল। বাংলা কাব্যসংগীতের ইতিহাসে টপ্পার একটি শতাধিক বছরের ঐতিহ্য আছে। বাংলায় টপ্পা প্রবর্তনের সঙ্গে নজরুল কর্তৃক গজল প্রবর্তনের বিষয়টি তুলনীয় এজন্য যে নিধুবাবুকালী মীর্জা যেমন হিন্দুস্তানী টপ্পার আদর্শে বাংলায় একটি নবসংগীতধারার সূচনা করেছিলেন, নজরুল ইসলামও তেমনি হিন্দুস্তানী ও ফারসি গজলের আদর্শে বাংলায় গজল প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তবে নজরুল প্রবর্তিত গজলসংগীতের টপ্পাতুল্য অনুসরণ হয়নি তার কারণ হিসেবে যদি বলা হয় নজরুল বাংলার জীবনযাত্রার সঙ্গে বেমানান সাকী, সুরা, সরাই নিয়ে গজল রচনা করেছিলেন বলে নতুনত্বের সাময়িক স্বাদ বিতরণ করেই তার গতি অবরুদ্ধ হয়ে গেছে, তাহলে আপত্তি ঠেকে। সাকি, সরাই, শরাব, গুল, বুলবুল প্রভৃতি ফারসি গজলের ঐতিহ্যবাহী অনুষঙ্গ নিয়েই যে কেবল নজরুল গজল রচনা করেছিলেন তা নয়। এ নিয়ে তিনি কয়েকটি গজল রচনা করেছিলেন। বাংলা কাব্যসংগীতের আবহমান অনুষঙ্গে তিনি অনেক আকর্ষণীয় গজলও রচনা করেছেন। সেসব গজল সর্বার্থে খাঁটি বাংলা গান, সর্বার্থে ফার্সিয়ানামুক্ত। তাই গজলের ধারা অবলম্বনে বাংলা কাব্যসংগীতের ব্যাপক ঐতিহ্য গড়ে না ওঠার জন্য শুধু এর বিষয়ানুষঙ্গের বৈদেশিকতাকে দায়ী করা চলে না।

তারচেয়ে বরং একথা বলা অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত মনে হয় যে বাংলা কাব্যসংগীতের যে পরিস্থিতিতে নজরুল ইসলাম গজল রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, সে পরিস্থিতিপরবর্তী দিনগুলো আর যাই হোক সম্ভবত গজল রচনার উপযোগী ছিল না। তাই সম্ভবত নজরুল প্রবর্তিত গজলের ধারাবাহিক অনুসরণ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বাংলা কাব্যসংগীতের এক যুগসন্ধিক্ষণে, আবির্ভূত হয়েছিলেন নজরুল ইসলাম। আবহমান রীতিতে বাংলা গান কবির কীর্তি, যিনি কবি বা গীতরচয়িতা তিনিই তাঁর গানের সুররচয়িতা কিন্তু ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়ে যাবার মুহূর্তে বাংলা গানের ইতিহাসে নজরুল ইসলামের প্রতিষ্ঠা। প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনিই বাংলা কাব্যসংগীতের ক্ষেত্রে সর্বশেষ প্রতিনিধিত্বশীল কবি। এরপর থেকেই প্রতিনিধিত্বশীল বাঙালি কবিরা সংগীতরচনার ধারা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করলেন। গীতরচয়িতা ও সুরকাররূপে একই গানের দুই নির্মাতার আবির্ভাব ঘটল। বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনায় শ্রোতৃচিত্তাভিমুখী সংগীত রচনার এক নতুন সুরপ্রধান যুগের উন্মেষ ঘটল। বাংলা গান এক ধরনের উৎপাদনী ব্যবস্থার করতলগত হয়ে পড়ল। কবির নিভৃতপ্রাণের মর্মর আর বাংলা গানকে আন্দোলিত করল না। এই যুগ গজল রচনার উপযুক্ত সময় নয়। গজলতো বাণীপ্রধান গান, গজল কবিপ্রাণের অভিব্যক্তি। বাংলা গানের ধারা থেকে কবিদের বিদায় গ্রহণের কালে যে কাব্যগীতিধারার সূচনা, সুরপ্রধান ব্যবসায়ী গানের যুগে তার প্রসার না হওয়াই স্বাভাবিক। তাই টপ্পার ধারায় যা ঘটা সম্ভব হয়েছিল গজলে তা হয়নি।

কাজী নজরুল ইসলাম নিজেই তাঁর গজলের প্রবাহকে ধারণ করে বাংলা কাব্যসংগীতের এক যুগপ্রতিভূরূপে অবস্থান করলেন। এই ইঙ্গিতও তাঁর রচনায় থাকল যে গজলের ধারা অবলম্বনে বাংলা কাব্যসংগীতের ক্ষেত্রে গভীর কিছু করার অবকাশ আছে প্রচুর। একাজে ভবিষ্যতে যাঁরাই ব্রতী হোন না কেন, কাজী নজরুল ইসলাম হবেন তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়।

সাপ্তাহিক *দেশ* পত্রিকায় রাজ্যেশ্বর মিত্রের 'নজরুলের সংগীতচিন্তা' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর নজরুলের গজলের গায়ন সম্পর্কে কয়েকটি পত্র প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি থেকে আমার বর্তমান আলোচনায় একাধিক উদ্ধৃতি দান করা হয়েছে। সেখানে রাজ্যেশ্বর মিত্র নজরুলের গজলের গায়কীরূপ সম্পর্কে যে অভিমত রেখেছেন সে সম্পর্কেই পত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। সেখান থেকে দু'টি পত্র এখানে উপস্থাপিত করা হল। রাজ্যেশ্বর মিত্র বলেছিলেন, 'যে দু'টি গানের উলেখ করেছি (বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল এবং আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী) সে দু'টি গানের সুরও ফারসি কাব্যপাঠের রীতিতে দেওয়া। কবি এই নতুন ধরনের গানে বিস্তার বা অন্যান্য কাজের সুযোগ রাখেননি, যাতে একটি মূল বিশিষ্ট ফারসি গজলের আবৃত্তির রীতিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আজকাল অনেক গায়কগায়িকা এইসব গা নে নানারকম ওস্তাদী খাটাতে চান কিন্তু যদি তাঁরা কবির উদ্দেশ্যকে হৃদয়ঙ্গম করতেন তাহলে আর একটু সংযত হয়ে চলতেন।' এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই পত্র। প্রথমে ছাপরা, বিহার থেকে লেখা গোপাল মিত্র লিখিত পত্রটি উদ্ধৃত করা হচ্ছে:

'শ্রী রাজ্যেশ্বর মিত্র 'নজরুলের সংগীতচিন্তা' (*দেশ* ২৮শে মে, ১৯৭৭) প্রবন্ধে 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল' ও 'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী' গান দু'টির উলেখ করে মন্তব্য করেছেন– 'যে দু'টি গানের উলেখ করেছি সে দু'টি গানের সুরও ফারসি কাব্যপাঠের রীতিতে দেওয়া। কবি এই নতুন ধরনের গানে বিস্তার ও অন্যান্য কাজের সুযোগ রাখেননি, যাতে মূল ফারসি গজলের আবৃত্তির রীতিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আজকাল অনেক গায়কগায়িকা এইসব গা নে নানা রকম ওস্তাদী খাটাতে চান, কিন্তু তাঁরা যদি কবির উদ্দেশ্যকে হৃদয়ঙ্গম করতেন তাহলে আর একটু সংযত হয়ে চলতেন।'

এই মন্তব্য সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন থেকে যায়। ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা *নজরুল স্বরলিপি* নামে যে বইটি নজরুলের নিজের সম্পাদনায় প্রকাশ করেন (প্রথম সংস্করণ ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত বলে মনে হয়) তার সপ্তম সংস্করণে দেখতে পাচ্ছি, নজরুল নিজে 'কে বিদেশী মন উদাসী' গানটির স্বরলিপি দিয়ে শেষে লিখেছেন 'কয়েকটি কথার উপর পুনরুক্তিস্থলে গায়কগায়িকার কিরূপ অভিনবত্ব আনা সম্ভব, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইতেছে; এই কথা লিখে তিনি পাঁচটি বিভিন্নপ্রকারের ছন্দের বৈচিত্র্য ও সুরের বিস্তার স্বরলিপি করে দেখিয়ে দিয়েছেন। সন্দেহ নেই, গায়ককে বিস্তার ও অন্যান্য কাজে উৎসাহ দেবার জন্যেই তাঁর এই পথ প্রদর্শন। এই স্বরলিপি গ্রন্থেই 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' গানটির স্বরলিপির শেষে আবার লিখেছেন, 'উলিখিত অন্তরাগুলিকে প্রথমে অন্তরার সুরেই গাহিতে হইবে। তবে প্রথম অন্তরার জ্বালা কথাটির উপর গজলের সুরের কাজের যে ঢঙ-এর নিদর্শন দেওয়া হইল, অপরাপর অন্তরায় বাক্য বিশেষের উপর আর্টিস্ট পৃথক পৃথকভাবে সুরের কাজের সৃষ্টি করিয়া গানের একঘেয়েমিভাব দূর

করিবেন, এই আশায় অন্য অন্তরাগুলির কেবল ছন্দভাগ করিয়া দেওয়া হইল।'

এই স্বরলিপির বইয়ের 'বাগিচায় বুলবুলি' ও 'আমারে চোখ ইশারায়' গান দু'টিতে নজরুল যে স্বরলিপি দিয়েছেন তার ক্রম ঠিক 'কে বিদেশী' ও 'কেউ ভোলে না'র ক্রমের অনুরূপ। শেষোক্ত গান দু'টির মতই শুধু অস্থায়ী ও অন্তরার একটি করে স্তবকের সুর দেওয়া আছে। যে স্বরলিপি দেওয়া আছে তাতে নজরুলের উপদেশমত ভিন্ন ভিন্ন অন্তরার ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বিস্তার বা অন্যান্য কাজ না করলে গান দু'টি যে শ্রোতা ও গায়কের পক্ষে একান্ত ক্লান্তিকর হবে একথা অনস্বীকার্য। অন্তরায় বৈচিত্র্য না আনলে কবি সম্মেলনে পাঠ করা চলবে না, আসরেও গাওয়া চলবে না। মোসায়েরায় যেসব কবিতা সুর দিয়ে পাঠ করা হয় সেগুলিতেও অন্তরার সুরে পরিবর্তন আনা হয়। অতএব বুঝতে অসুবিধা হয় না যে 'বাগিচায় বুলবুলি' ও 'আমারে চোখ ইশারায়' গান দু'টিতে অভিনবত্ব আনার জন্য নজরুলের উপদেশ পালনীয় ও উদাহরণ অনুসরণীয়।

মনে হয়, হাফেজের গজলের ছাঁচের প্রতি নজরুলের আনুগত্যের দিকটা অনুমান করতে গিয়ে শ্রীমিত্র ভুলে গেছেন যে, নজরুল তাঁর গজলকে সুর করে ফারর্সি কাব্যপাঠের গতানুগতিকতায় আবদ্ধ না রেখে উর্দু গজলের স্বাধীন বিস্তারের পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। নজরুলের নিজের লেখা উপদেশ এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ রাখে না।'

দ্বিতীয় পত্রটি কলকাতা থেকে লিখেছেন প্রণবকুমার ঘটক। তাঁর পত্রটি গোপাল মিত্রের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। তিনি লিখেছেন:

'শ্রী গোপাল মিত্র নজরুলের বাংলা গজলকে স্বাধীন বিস্তারের পথে নিয়ে যাবার উপদেশ দিয়েছেন এবং *নজরুল স্বরলিপি* নামক একটি গ্রন্থে কবির কিঞ্চিৎ সদুক্তি থেকেই তাঁর এই অনুমান। রাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয় তাঁর প্রবন্ধে আজকালকার গায়ক সম্প্রদায় যে 'ওস্তাদী' খাটাতে চান সে প্রবন্ধেই নজরুলের গজল আড়ষ্টভাবে গাওয়া হোক একথা একবারও বলেননি। গোপাল বাবুর উদ্ধৃত 'কে বিদেশী' ও 'কেউ ভোলে না' প্রভৃতি আরো বহু গানই নজরুলের সাক্ষাৎ পরিচালনায় রেকর্ড করা হয়েছিল। তৎকালে তিনি নিজেই এসব গান শোনাতেন। কই, কোথাও তো কবি খুব একটা স্বাধীন বিস্তারের প্রশ্রয় দেননি। আজকাল অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক অথচ নামকরা গায়কগায়িকা, যারা আ দৌ নজরুলের সাক্ষাৎ পরিচয় পাননি, যেটা করছেন সেটা তাঁদের পরিকল্পিত ওস্তাদী, যাতে নজরুলের ইঙ্গিতের কিছুমাত্র পরিচয় নেই। তাঁরা ফারসি দূরে থাক, উর্দু গজলেও যে পারদর্শী নন সেটা তাঁদের 'স্বাধীন বিস্তারের' পথ দেখলেই বোঝা যায়। গানকে লীলায়িত করবার বিষয়ে নজরুলের একটা সুনির্দিষ্ট রীতি ও নীতি ছিল। যেটুকু মানানসই সেটা তিনি নিজেই প্রকাশিত রেকর্ডে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। সেটাই আজকালকার আর্টিস্টদের পক্ষে যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল। গোপাল বাবুর পন্থা অনুসরণ করলে উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া নজরুলের গানে আর কিছুই ঘটবে না। আরও একটা কথা বলা আবশ্যক। নজরুলের বহু গান আজকাল শোনা যাচ্ছে যা আদৌ কবির সুর দেওয়া কিনা সন্দেহ। কবি কি কোন গ্রন্থে তাঁর গানে নতুন সুর প্রয়োগ করবার সপক্ষেও মত দিয়ে গেছেন?'

প্রথম পত্র লেখক গোপাল মিত্র রাজ্যেশ্বর মিত্রের সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত নন যে নজরুল ইসলামের গজলের গায়নাদর্শ হচ্ছে আবৃত্তিভঙ্গিমতা। তিনি গজলের গায়নে সুরবিস্তারের পক্ষপাতী এবং এই প্রসঙ্গে *নজরুল স্বরলিপি* গ্রন্থে কবি নিজে কয়েকটি গজল স্বরলিপির নিচে গায়ককে সুরবিস্তারগত স্বাধীনতা দিয়ে মন্তব্য রেখেছেন, তার উলেখ করেছেন এবং তাঁর ধারণা যে গজলরূপায়ণে সুরবিস্তারকর্ম এই গানের গায়কী আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তাঁর বক্তব্য আরো যে নজরুলের গজল ফারসি গজলের আবৃত্তিমূলক সুরকর্মের নয়, বরং উর্দু গজলের বিস্তারমূলক সুরকর্মের ঐতিহ্যানুসারী। দ্বিতীয় পত্রলেখক প্রণবকুমার ঘটক নজরুলের গজলের স্বাধীন সুরবিস্তারমূলক গায়নের পক্ষপাতী নন। তিনি নজরুলের নিজস্ব গায়কী ও তাঁর পরিচালনায় করা রেকর্ডে বিধৃত গায়কীর দৃষ্টান্ত উলেখ করে বলেছেন যে, নজরুলের গজল গায়নের মূল বৈশিষ্ট্য স্বাধীন সুরবিস্তারগত সংগীতকলায় নিহিত নয়। সুরবিস্তার সীমিত অর্থেই গ্রাহ্য, যার প্রতিভূ কবির নিজের গায়ন ও তাঁর সময়ের রেকর্ড। তবে গোপাল মিত্র প্রণবকুমার ঘটকের মত মেনে নেননি। বরং নিজের অভিমত ব্যাখ্যা করে তিনি আর একটি পত্র দেন। সেটিও *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেটিও এখানে উদ্ধৃত করলাম। তিনি লিখেছেন:

'শ্রী প্রণবকুমার ঘটক চিঠিপত্র বিভাগে (*দেশ*, ৩০ জুলাই, ১৯৭৭) লিখেছেন, আমি নজরুলের বাংলা গজলকে স্বাধীন বিস্তারের পক্ষে নিয়ে যাবার উপদেশ দিয়েছি। এ কথাও লিখেছেন যে, স্বাধীন বিস্তারের পন্থা আমার অনুমান প্রসূত। মনে হয় *দেশ* (৯ই জুলাই, ১৯৭৭)এ প্রকাশিত আমার চিঠি তিনি ভাল করে পড়েননি।

প্রথমত উপদেশ আমার প্রদত্ত নয়। প্রণববাবু 'কবির কিঞ্চিৎ সদুক্তি' বলে নজরুলের উক্তির গুরুত্ব দেননি, উপদেশ তার মধ্যেই নিহিত। শুধু একখানি গানে পাঁচ প্রকার বিভিন্ন বিস্তারের নমুনা দিয়ে নজরুল বলেছেন, বিস্তারের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইতেছে। তাছাড়া স্বরলিপির মাধ্যমে 'গজলের সুরের কাজের ঢঙের নিদর্শন' দিয়ে আর্টিস্ট পৃথক পৃথকভাবে সুরের কাজের সৃষ্টি করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নজরুল বললে কি হবে, ঘটক মহাশয় বলছেন, 'কই কোথাও তো কবি খুব একটা স্বাধীন বিস্তারের প্রশ্রয় দেননি'। এ ব্যাপারে কার মত গ্রাহ্য, ঘটক মহাশয়ের না নজরুলের?

দ্বিতীয়ত, স্বাধীন বিস্তারের পন্থা আমার অনুমানপ্রসূত নয়। যেখানে স্বয়ং সুরকারের প্রত্যক্ষ নির্দেশ আছে, সেখানে অনুমানের কথা আসে না। তাছাড়া সেকালের প্রতিষ্ঠিত নজরুলের সংগীতের শিল্পীদের কণ্ঠে আমি নজরুলের গজল শুনেছি। প্রায় পঁয়তালিশ বছর পূর্বে শ্রী অনিল বাগচী মহাশয় ছাপরায় কয়েক দিনের জন্য এসেছিলেন, তিনি সাধারণ আসরে নজরুলের গজল গেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন সেই গান নজরুলের কাছেই শেখা। অতি মনোহারী স্বাধীন বিস্তার দিয়ে তিনি শেরএর অংশ গেয়েছিলেন, সেকথা আজো আমার মনে আছে। পাটনার শ্রী প্রফুল- সেনগুপ্ত মহাশয় (যিনি যৌবনে ঠুংরী প্রতিযোগিতায় শ্রী ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সমগৌরব লাভ করে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন) নজরুলের সংগীতগুরু ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেবের কাছে ঠুংরী ও নজরুলের কাছে তাঁর গান শেখেন। তাঁকে সুন্দর স্বাধীন বিস্তার দিয়ে নজরুলের গজল গাইতে শুনেছি। তিনি আজও বর্তমান এবং কাজী অনিরুদ্ধ তাঁর কাছে নজরুলের বিস্মৃত গান উদ্ধার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন একথাও জানি।

শ্রী গোপাল মিত্র নজরুলের বাংলা গজলকে স্বাধীন বিস্তারের পথে নিয়ে যাবার উপদেশ দিয়েছেন এবং নজরুল স্বরলিপি নামক একটি গ্রন্থে কবির কিঞ্চিৎ সদুক্তি থেকেই তাঁর এই অনুমান। রাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয় তাঁর প্রবন্ধে আজকালকার গায়ক সম্প্রদায় যে 'ওস্তাদী' খাটাতে চান সে প্রবন্ধেই নজরুলের গজল আড়ষ্টভাবে গাওয়া হোক একথা একবারও বলেননি। গোপাল বাবুর উদ্ধৃত 'কে বিদেশী' ও 'কেউ ভোলে না' প্রভৃতি আরো বহু গানই নজরুলের সাক্ষাৎ পরিচালনায় রেকর্ড করা হয়েছিল।

তিরিশের দশকে শ্রীমতী কমলা ঝরিয়াকেও ইচ্ছামত বিস্তার দিয়ে নজরুলের গান গাইতে শুনেছি। বাহুল্যভয়ে উদাহরণ বৃদ্ধি করলাম না। এইসব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে নজরুলের লিখিত উপদেশ যুক্ত করলে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, নজরুলের গজলে গায়কের স্বাধীনবিস্তারের অবকাশ আছে।

প্রণববাবু যেসব রেকর্ডের কথা লিখেছেন, সেইসব রেকর্ডের নম্বর ও কণ্ঠশিল্পীদের নাম দিতে পারেননি। পারলে তাঁর কথা যথোচিতভাবে তথ্যভিত্তিক হত। অবশ্য নজরুলের কাছেই সেই শিল্পীরা শিক্ষা পেয়েছিলেন এর অবিসংবাদিত স্বীকৃতিও দরকার।

প্রণববাবু লিখেছেন, 'গোপালবাবুর পন্থা অনুসরণ করলে উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া নজরুলের গানে আর কিছু ঘটবে না।' স্বাধীন বিস্তার ও উচ্ছৃঙ্খলতা যে এক জিনিস নয়, সে কথা কি লিখে বোঝাতে হবে? আজকালকার অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক অথচ নামকরা গায়কগায়িকা দের বিরুদ্ধে প্রণববাবুর যে বিক্ষোভ সেটা প্রকাশের জন্য তিনি অন্য ক্ষেত্র নির্বাচন করতে পারতেন। নজরুল স্পষ্ট ও লিখিতভাবে স্বাধীন বিস্তারের উপদেশ দিয়ে গেছেন তাঁর গজলে। সেই স্বাধীনতা যদি মাত্রা ছাড়ায়, তবে সেটা মাত্রাবোধহীন গায়কগায়িকার না ন্দনিক জ্ঞানের অভাব বলেই সূচিত হবে। কিন্তু সেজন্য স্বাধীন বিস্তার বন্ধ করার উদ্যোগ কেন? এই যুক্তির অনুসরণ করলে তো খেয়াল-ঠুংরীতেও স্বাধীন বিস্তার বন্ধ করতে হয়। কেননা, বাড়াবাড়ি সর্বত্রই বাড়াবাড়ি।'

নজরুল স্বরলিপির পাদটীকায় গায়ককে সুরবিস্তারগত নির্দেশ দিয়ে নজরুল যে মন্তব্য রেখেছেন তাতে গজলে গায়কের সুরবিস্তারের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। উর্দু গজলে সুররূপায়ণের যে ঐতিহ্য তার প্রভাবও যে নজরুলের গজলে ছিল একথাও অনস্বীকার্য। উর্দু গজলের সুর ভেঙ্গেও নজরুল একাধিক গজল রচনা করেছেন। বিষয়টির এক ধরনের নান্দনিক প্রতিষ্ঠা ঘটে গীতগ্রন্থ *বুলবুল*এর উৎসর্গ কবিতায় নজরুল যে বক্তব্য তা থেকেও। দিলীপকুমার রায়কে এই গজলসংকলন উৎসর্গ করতে গিয়ে কবি বলেছিলেন:

সুরশিল্পী, বন্ধু
দিলীপকুমার রায়
করকমলেষু

আমার শুধু এ বাণী হে বন্ধু, আমার শুধু এ গান।
তুমি তারে দিলে রূপরঙ্গিমা, তুমি তারে দিলে প্রাণ।
আমার ব্যথায় বেঁধেছিল নীড় যে গানের বুলবুলি,
আপনি আসিয়া আদরে তাহারে বক্ষে লইলে তুলি।
আমার পাখির কণ্ঠে মিশালে তোমার দরদ লয়ে,
আমার বেদনা বাজে আজ তাই সবার বেদনা হয়ে।
যে গান গেয়েছি একাকী নিশীথে কুসুমের কানে কানে,
ওগো গুণী, তুমি ছড়াইলে তারে সব বুকে সব খানে।
বুকে বুকে আজ পেয়েছে আশয় আমার নীড়ের পাখী,
মুক্তপক্ষ উড়িতে যে চায়– কেন তারে বেঁধে রাখি?
তোমার কাননে উড়ে গেল মোর বাগিচার বুলবুলি,
বড় ভীরু সে যে, দোস্ত, তাহারে দস্তে লইও তুমি।

১৫ই আশ্বিন, ১৩৩৫ নজরুল

এই উৎসর্গ কবিতার বক্তব্যেও দেখা যাচ্ছে, নজরুল গায়ককে তাঁর গান গাইবার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অধিকার দিচ্ছেন। দিলীপ রায়ও স্মৃতিচারণে এ ব্যাপারে জানাচ্ছেন: 'এক সময়ে আমি তার নানা গানই গাইতাম, বিশেষ করে প্রেমের গান, যথা 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল', 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে পানিয়া ভরণে চললো গোরী', 'এত জল ও কাজল চোখে পাষাণী আনলে বল কে', 'কেন কাঁদে পরাণ কি বেদনায় কারে কহি', 'চেয়ো না সুনয়না আর চেয়ো না এ নয়ন পানে', 'কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো কুসুম দিলে', 'কে বিদেশী মনউদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে', 'নিশি ভোর হল জাগিয়া পরাণ পিয়া', 'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী', 'করুণ কেন অরুণ আঁখি', 'গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু' প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে কয়েকটি কাজী নিজের হাতেই আমার খাতায় লিখে দিয়েছিল– সে খাতাটি আজো আছে।

তার সঙ্গে আমার আর একটি মস্ত মিল ছিল এইখানে যে, সে তার গানে সুরবিহারের স্বাধীনতা আমাকে সানন্দে দিত, যেমন দিতেন আমার পিতৃদেব ও অতুলপ্রসাদ। এ নিয়ে কবিগুরুর সঙ্গে মতভেদে কাজী ও অতুলপ্রসাদ বরাবরই ছিলেন আমার দিকে। তাইতো *বুলবুলের* উৎসর্গে কাজী আমাকে লিখেছিল:

যে গান গেয়েছি একাকী নিশীথে কুসুমের কানে কানে
ওগো গুণী, তুমি ছড়াইলে তারে সব বুকে সব খানে।
বুকে বুকে আজ পেয়েছে আশয় আমার নীড়ের পাখি
মুক্তপক্ষ উড়িতে যে চায় কেন তারে বেঁধে রাখি?

সে গুণী ছিল তাই বুঝত যে, মুক্তপক্ষ সুরকে স্বরলিপির কাঠামোতে বেঁধে রাখলে তার গগনবিহার ব্যাহত হয়ই হয়। আজ শুনি একদল অগায়ক ক্রিটিকের মুখে যে, এ স্বাধীনতা অক্ষমনীয়। কিন্তু অতুলপ্রসাদ ও কাজীর অনুমতি পাওয়ার পর এসব রুক্ষ ক্রিটিকের মাথানাড়া উপেক্ষা করা চলে।'

যে সমস্ত গানের উলেখ করে দিলীপকুমার রায় স্বাধীন সুর বিস্তারগত গায়কীর কথা বলেছেন তাদের অধিকাংশই গজল। তাই দেখা যাচ্ছে যে, তিনিও গজল শ্রেণির গানের স্বাধীন সুরবিস্তারগত গায়নের পক্ষপাতী। গজলের অন্তরাসমূ হে গায়কীবৈচিত্র্য দ্বারা একঘেয়েমি দূর করার কথা নজরুল স্থানান্তরেও উলেখ করেছেন।

তবে সুররূপায়ণের এই স্বাধীনতা যে কোন অবাধ ব্যাপার নয় তা বলাই বাহুল্য। গজল কাব্যসংগীত। সুরের সাহায্যে কাব্যভাবকে পরিস্ফুট করে তোলাই এর গায়কীর মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অটুট রেখে সুরের মূল কাঠামোর মধ্যে গায়ক যাকিছু স্বাধীনতা ভোগ করার তা করতে পারেন। তবে একথাও এখানে উলেখ করা প্রয়োজন গজলের গায়কীর ব্যাপারটি নজরুলের গানের সামগ্রিক গায়নরূপেরই একটা অংশ। নজরুল সংগীতের মূল সাংগীতিক নান্দনিকতারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এটি। ফলে গজলের গায়নরূপের প্রসঙ্গটি নজরুল সংগীতের গায়কীর সামগ্রিক পটভূমিতেই বিবেচনা করতে হবে।

● সমাপ্ত

কলিকাতা তোমার প্রতিভা ও প্রাণমুগ্ধ

করুণাময় গোস্বামী
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

নজরুল স্বরলিপির পাদটীকায় গায়ককে সুরবিস্তারগত নির্দেশ দিয়ে নজরুল যে মন্তব্য রেখেছেন তাতে গজলে গায়কের সুরবিস্তারের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। উর্দু গজলে সুররূপায়ণের যে ঐতিহ্য তার প্রভাবও যে নজরুলের গজলে ছিল একথাও অনস্বীকার্য। উর্দু গজলের সুর ভেঙ্গেও নজরুল একাধিক গজল রচনা করেছেন। বিষয়টির এক ধরনের নান্দনিক প্রতিষ্ঠা ঘটে গীতগ্রন্থ বুলবুল-এর উৎসর্গ কবিতায় নজরুল যে বক্তব্য তা থেকেও।

Standard Chartered

When businesses succeed, livelihoods flourish.

In 2009, we took the initiative to be first to align with the World Bank Group in boosting global trade flows. Since then, we have continued to be proactive in encouraging growth across our markets. As trade is the lifeblood of the local economy, our commitment does more than protect businesses. It stimulates the communities that depend on them.

Here for good

Discover more at
standardchartered.com/answers

গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা

৬ জুন ২০১৪ আজিজুর রহমান তুহিনের
রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন

৭ জুন ২০১৪ জান্নাতুল ফেরদৌস টুম্পার
সঙ্গীত পরিবেশন

১২ জুন ২০১৪ সি রাজামোহনের
বক্তব্যদান

২০ জুন ২০১৪ লিলি ইসলামের
রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন

২১ জুন ২০১৪ কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসকেন্দ্রিক পাঠচক্র

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra July 2014

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা এবং সহকারী হাই কমিশন, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর ভিসা সেবা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-কে আউটসোর্স করা হয়েছে। এসবিআই বাংলাদেশে ছয়টি ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি) পরিচালনা করে থাকে। এগুলি হচ্ছে: ১. আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা, ২. আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা, ৩. আইভিএসি, চট্টগ্রাম, ৪. আইভিএসি, সিলেট , ৫. আইভিএসি, খুলনা এবং ৬. আইভিএসি, রাজশাহী।

আইভিএসি-তে সকল কর্মদিবসে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। ভিসা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবার পর পাসপোর্ট বিকাল ৩টা থেকে সাড়ে ৭টার মধ্যে ফেরত দেওয়া হয়। আবেদন প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদির পূর্ণ বিবরণ **www.ivacbd.com** এবং **www.hcidhaka.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে ।

হেল্পলাইনসমূহ: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকায় আপৎকালীন প্রয়োজন মেটানোর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এখানে চিকিৎসা ও অন্যান্য জরুরি পারিবারিক প্রয়োজন সংক্রান্ত ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্যে একটি কাউন্টার রয়েছে।

আইভিএসি, গুলশান-এর হেল্পলাইন ডেস্ক: ই-মেইল: info@ivacbd.com, এবং visahelp@ivacbd.com; ফ্যাক্স: +৮৮০২ ৯৮৬৩২২৯; টেলিফোন: +৮৮০২ ৮৮৩৩৬৩২, +৮৮০২ ৯৮৯৩০০৬ (রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা)

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার ভিসা হেল্পলাইন ডেস্ক: ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in; টেলিফোন: +৮৮০২ ৯৮৮৮৭৯২ (রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা)

জনসাধারণের জন্য জ্ঞাতব্য:

- ভারতীয় ভিসা পেতে বাংলাদেশের নাগরিকদের কোনও ভিসা ফি দিতে হয় না। আইভিএসি প্রক্রিয়া ফি বাবদ আবেদনপত্র পিছু যে চারশত টাকা নেয়, তা ফেরতযোগ্য নয়।
- ভিসা আবেদনপত্রে প্রদত্ত সকল তথ্যের নির্ভুলতার ব্যাপারে আবেদনকারী দায়ী থাকবেন।
- আবেদনপত্রে যে কোন ভুলের জন্য আবেদনপত্র অগ্রহণযোগ্য হতে পারে।
- আবেদনপত্রের সঙ্গে সদ্যতোলা ছবি (৩ মাসের বেশি পুরনো নয়) সংযোজন করতে হবে।
- আবেদনকারী ভারতভ্রমণে কোন্ শ্রেণীর ভিসা চান তার উলেখ করতে হবে–
  - ১. মনে রাখতে হবে যে, একান্ত জরুরি না হলে ট্যুরিস্ট ভিসায় ভারতে গিয়ে চিকিৎসা করানোর অনুমতি নেই।
  - ২. নিয়মিত ও পূর্ব-নির্ধারিত চিকিৎসা সেবার জন্য কেবল মেডিক্যাল ভিসার জন্যই আবেদন করতে হবে।
  - ৩. রোগীর সঙ্গে মাত্র ৩ জন মেডিক্যাল এটেনডেন্ট যেতে পারবেন এবং তাঁদের একত্রে ভিসার আবেদন করতে হবে।
  - ৪. ব্যবসায়ের জন্য ভারতে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বিজনেস ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে।
- ভুল তথ্য-উপাত্ত সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রদানের জন্য আবেদনকারীরাই দায়ী থাকবেন।
- আবেদনপত্র জমা নেওয়ার সঙ্গে ভিসাপ্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা নেই। যে কোনও সময় কোন কারণ ছাড়াই ভিসা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে।

উপরোক্ত নিয়মাবলী পালন করলে ভিসাপ্রাপ্তি সহজ হবে।

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত